জীবন দেবতা ঃ তত্ত্ব ও কাব্যরূপ

রমেন্দ্র বর্মণ

পৌষের কোন এক ঝিল্লিমুখরিত রাত্রিতে অবগুণ্ঠিতা অশ্বারোহিনীর নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে কবি যখন তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর তখন তাঁর (কবির) এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা এ ভাবে ব্যক্ত করেছেন

> মনে হল মেঘ, মনে হল পাখি, মনে হল কিশলয়,
> ভাল করে যেই দেখিবারে চাই, মনে হল কিছু নয়।
> দুইধারে এক প্রাসাদের সারি ? অথবা তরুর মূল ?
> অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল ?

জীবন দেবতা তত্ত্বের পরিচয় গ্রহণে উৎসুক হয়ে আমাদেরও প্রায় কবির অবস্থা। জীবন দেবতাকে ভিত্তি করে রবীন্দ্র সমালোচক গোষ্ঠী এক একটি নিজস্ব Theory তৈরী করেছেন। অজিত কুমার বললেন, জীবন দেবতা হলো 'ever evolving personality' ক্রমশ উদ্ভিন্নমান ব্যক্তিত্ব। ডাঃ নীহার রঞ্জনের মতে রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতার সঙ্গে বিশ্বজীবনের অনুভূতির একটা নিবিড় যোগ রয়েছে যদিচ তিনি জীবন দেবতার সঙ্গে বিশ্বদেবতার সংযোগ স্বীকার করেন না। ডাঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত নিশ্চিতই ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য হলো জীবনদেবতা 'চির-নবীনতার দেবতা' কবির জীবন খেয়াতরীর মাঝি এবং স্পষ্টতই

তিনি বিশ্বদেবতায় রূপান্তরিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির উল্লেখ করে বললেন জীবন দেবতা আহ্নিকগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থাৎ জীবন দেবতা কবির ব্যক্তি সত্তার দেবতা কিন্তু জীবন দেবতাই আবার ব্যক্তি ও বিশ্বের (বার্ষিক গতি ?) মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতু। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মতে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি ও মর্ত্য উপলব্ধির যোগফল হলো জীবন দেবতা। এরপরও আছে জীবন দেবতা সম্পর্কে কবির ভাষ্য। সুতরাং 'যত মত তত পথ' কথাটির সার্থকতা এখানে হয়ত কিছুটা পাওয়া যাবে কারণ মত ও পথের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃতি উদাহরণের কমতি হয়নি। বস্তুতঃ এখনও যদি বলি আমাদের কথাটি ভুলে যাইনি তবে নিতান্তই সত্যের অপলাপ করবো।

কিন্তু জীবন দেবতা তত্ত্বের ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে হলে প্রথমতঃ তত্ত্বটিকে অনুধাবন করতে হবে। সুতরাং আবার সেই পূর্ব্বের তর্কজালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সমস্ত তর্ককে এড়িয়ে যাওয়া চলে যদি কবির সাক্ষ্য শেষ কথা বলে স্বীকার করি। জীবন দেবতা সম্পর্কে এই একমাত্র পথ কিনা জানিনে কিন্তু শ্রেষ্ঠ পথ যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের মনে হয় জীবন দেবতা রবীন্দ্রনাথের সার্বিক কবি সত্তাকে প্রকাশে সক্ষম। বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের প্রতি নিবিড় ভালোবাসায় এর প্রথম সূত্রপাত, সৌন্দর্যালক্ষ্মীরূপে এর ক্রম-বিকাশ, অন্তরলক্ষ্মীরূপে তাঁকে বরণ ও জীবন স্বামীরূপে তাঁর

নিকট আত্ম-সমর্পণে এর পরিণতি। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ একে এককথায় বলবেন 'অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তি'। কিন্তু সৃজনী শক্তির দুর্বার প্রেরণাইতো কবিকে রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে বিবর্তিত করেছে—কবি এক অপ্রতিহত শক্তির তাড়নায় ঐক্য ও সামঞ্জস্যের সন্ধান করেছেন। তাই কবির মনে হয়েছে 'নবরে নব তুই নিতুই নব'। সে জন্যই দেখি কবির বিস্মিত জিজ্ঞাসা—

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।

এই কৌতুকময়ীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় বিশ্ব-প্রকৃতির মাধ্যমে। কবির প্রথম স্বপ্নভঙ্গ হলো 'জগৎ আসি যেথায় করিছে কোলাকুলি' সেখানে। কবি বললেন 'জগৎ দেখিতে হইব বাহির'। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের।' এর মৃত্তিকার সঙ্গে একত্রিত হয়ে কবি অনন্তকাল সূর্য প্রদক্ষিণ করেছেন—কবি তাঁর প্রাণ সত্তাকে অনুভব করেছেন এভাবে—

এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি—
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোহে কেঁপেছি।

এই অনুভূতি গভীরতর হবার পর—

শুধু জানি তাহারি মহান

গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে।
তাহারি অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে
তারি বিশ্ব-বিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেম মূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে।—

অর্থাৎ কবির জীবন দেবতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে—'অন্তরে বহিয়া নিরুপমা সৌন্দর্য্য প্রতিমা'। ফলত কবির বক্তব্য কেড়ে নিয়ে, ভাষা কেড়ে নিয়ে পান্থকে দিকভ্রান্ত করে, অজানা বেদনাকে জাগিয়ে—

আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা
কিসের লাগিয়া বিশ্ব-বেদনা
মোর বেদনায় বাজে
মোর প্রেম দিয়ে তোমার রাগিণী
কহিতেছে কোন অনাদি কাহিনী
কঠিন আঘাতে ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর

এই জন্যই কি কবি বলেছিলেন 'শুধু মালঞ্চের হব মালাকার' এজন্যই কি 'নিষ্ঠুর পীড়নে দলিত দ্রাক্ষা সম' জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছেন ? তাই কবির প্রশ্ন—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন দেবতার

রহস্য ঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দির তলে ?

তবে তাই হোক। সৌন্দর্যলক্ষ্মী আজ অন্তর লক্ষ্মীরূপে আবির্ভূত হোক— কবি আত্মসমর্পণ করে ধন্য হবেন। শুধু প্রশ্ন অন্তরতমের সাধ কি এতে মিটবে ?

লেগেছে কি ভালো, হে জীবন নাথ
আমার রজনী, আমার প্রভাত
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে ?

যদি তাই হয়ে থাকে তবে—

আন নবরূপ, আনো নব শোভা
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে—
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমার
নবীন জীবন ডোরে।

সেই কৌতুকময়ী সৌন্দর্য্য প্রতিমা নতুন বিবাহ বন্ধনে কবির সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছেন এখন অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী অন্তর-রূপিনী। কবি জানেন এরপর কবির যা কিছু পরিবর্তন রূপান্তর সব কিছুই অদৃশ্য অন্তরলক্ষ্মীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে। বস্তুতঃ, তাঁর সমগ্র কাব্য জীবনই তো কোন এক অদৃশ্য মায়াবিনীর লীলা বিলাস।

কবির ধ্রুব বিশ্বাস—

হে চির পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

চিত্রা কাব্য পর্য্যন্ত কবির জীবন দেবতার এই বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। এরপর স্পষ্টত জীবন দেবতা বিষয়ক অর্থাৎ জীবন দেবতার উল্লেখ যুক্ত কবিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে কি জীবন দেবতার এখানেই পরিসমাপ্তি? আমাদের মনে হয়—

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া—
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।

তাই চিত্রার পর খেয়া, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, উৎসর্গ, প্রভৃতি কাব্যে অন্তরলক্ষ্মীকে জীবন-নাথরূপে প্রকাশিত হতে দেখি। (মনে রাখতে হবে চিত্রায়ই পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ ঘটেছে। এখন শুধু লীলা বিলাস) এতে জীবন দেবতারই আর এক রূপ, তাই কবি বারংবার আহ্বান করে বলেছেন 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে। এস গন্ধে বরণে, এস গানে'। তাই নবরূপ বরণের ভিতর দিয়ে কবির সঙ্গে জীবন দেবতার নতুন পরিচয়। অন্তর-লক্ষ্মী এখন জীবন স্বামী। এখন নম্র হয়ে নত হয়ে তাঁর পূজারতি।

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী
দাঁড়াবো তোমার সম্মুখে,
করি জোড় কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াবো তোমার সম্মুখে।

এখন মাথা নত করে দেবার জন্য আকুল প্রার্থনা 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে'। সমস্ত অহংকারকে জীবন-নাথের চরণে বিসর্জন দিয়েই তো কবির পরিতৃপ্তি কবির ধ্রুবমন্ত্র। 'আমি সকল গর্ব্ব করি দিব দূর তবু তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না'। আর ছাড়েন নি বলেই তো—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হল যেন চিনি
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা
ছিলে লীলা সঙ্গিনী।

সেই বাসনা-বাসিনী মানসরূপিনী লীলাসঙ্গিনী কবিকে ভুলে থাকতে পারেন তাই তো 'মনে পড়ি গেল বুঝি বন্ধুরে।' তাই পরিশেষের একটি কবিতায় রয়েছে—

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত নামে কত জন্ম করে পারাপার
কত বারংবার।
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে
সর্বত্র গামীরে।

সম্মুখে শান্তি পারাবার দেখেও তো 'কবির অন্তরে তুমি কবি' অর্থাৎ কবির কবি সেই কর্ণধারের কথা মনে হয়েছে। আর শেষবারের মতো কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে

হে ছলনাময়ী।— আর এই ছলনাময়ী কি কবির জীবন দেবতা নয়? সে-ইতো—'চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি'।

আলেকজান্দার ডুমা

বিমল গুপ্ত

ছোট্ট একটি ছেলে। বয়স মাত্র চার বছর। অল্প কয়েকদিন হয় বাবা মারা গেছে। মৃতের ঘরটি খালি, একটা শান্ত স্তব্ধতা সেখানে বিরাজমান। সদ্যবিধবা মা হঠাৎ সে ঘরে কি একটা কাজে গেছেন। গিয়ে দেখেন ছোট ছেলেটি প্রকাণ্ড একটা রাইফেল টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। মা অবাক—কি হচ্ছে এখানে?

স্বর্গে যেতে চেষ্টা করছি।

কেন? কিসের জন্য?

ভগবান আমার বাবাকে মেরেছে। তার সঙ্গে ডুয়েল লড়ব। অসমসাহসী ছেলেটি জবাব দিল নির্ভীক কণ্ঠে। এই অপরাজেয় চার বছরের ছেলেটিই উত্তরকালের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক আলেকজান্দার ডুমা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন লেখনী চালনা করেছেন আজীবন।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, কাউন্ট অব মন্টে ক্রিস্টো, ব্ল্যাক টিউলিপের অমর লেখক ডুমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এড্‌ভেঞ্চারের আকর্ষণ রোমাঞ্চের হাতছানি তাঁদের বংশের রক্তেই উপ্ত ছিল। ডুমার পিতামহ এই দুর্নিবার আকর্ষণেই, যৌবনে স্বদেশের নিশ্চিন্ত জীবন উপেক্ষা করে এক অপরিচিত দ্বীপে চলে যান। আপন বাহুবলে সেখানে প্রতিষ্ঠা পান এবং রাজকীয় মর্য্যাদায় দিন কাটাতে থাকেন। অসংখ্য কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস তাঁর মনোরঞ্জন করত। তার মধ্যে উচ্ছল যৌবনা এক ক্রীতদাসীকে ভালবাসলেন তিনি—নাম লুই ডুমা। বিয়ে হল। শ্বেতাঙ্গের ঔরসে আর কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসীর গর্ভেই জন্ম নিলেন ডুমার পিতা টমাস আলেকজান্দার।

পিতার রক্ত টমাসের ধমনীতেও প্রবহমান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চাইলেন। পিতা বললেন যুদ্ধে যোগ

দিতে চাও ভাল কিন্তু আমার বর্ণসঙ্কর ছেলে আমার অভিজাত পদবী ব্যবহার করবে তা আমি চাইনা। নাম দিতে হয় তোমার মার পদবী ব্যবহার কর। তাই হল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে টমাস আলেকজান্দার দ্যুমা পদবী ব্যবহার করে ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন এবং আপন ক্ষমতাবলে ও অসাধারণ বীর্যাবত্তায় মাত্র সাত বৎসরের মধ্যে সামান্য সেনানী থেকে সৈন্যাধ্যক্ষে উন্নীত হলেন। তিনি ছিলেন এক অদ্ভুত উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যোদ্ধা। বর্ণসঙ্কর, কাল চামড়া আর বাদামী চুলের এই অদ্ভুত যোদ্ধা ঝড়ের বেগে পিরেনিজ পর্ব্বতমালা অধিকার করে দু' হাজার বন্দী নিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশবাসী মুগ্ধ হল তার সাহসিকতায়। একবার একটি সেতু রক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে একদল শত্রুর সঙ্গে একাই লড়াই করে তাদের পরাজিত করেন। সেতু রক্ষা পেল সত্য কিন্তু ভীষণ ভাবে আহত হলেন টমাস, জ্ঞান হারালেন সেখানেই। জনৈক সেনানী তাঁকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল তিনি আহত কিনা। তিনি কোন মতে চোখ মেলে উত্তর দিলেন—না আমি আহত নই তবে অনেককে আহত করেছি।

টমাস আলেকজান্দার মনে প্রাণে ছিলেন খাঁটি বিপ্লবী। নেপোলিয়নের পক্ষে তিনি বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়নের স্বৈরাচারকে মোটেই ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। অপ্রিয় স্পষ্ট কথা বলায় তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন এবং সেনাবাহিনীর সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে তিনি বিয়ে করেছেন এবং এক বলিষ্ঠ সন্তানের জনক হয়েছেন। এই সন্তানই আমাদের আলোচ্য সাহিত্যিক আলেকজান্দার দ্যুমা। ছোটবেলায় তাঁর দৈহিক ওজন ছিল নয় পাউণ্ড আর লম্বা ছিল আঠারো ইঞ্চি। দ্যুমার গায়ের রঙ সাদা, চোখ নীল। শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গের সংমিশ্রনের কোন নিদর্শন শুধু একজায়গা ছাড়া অন্য কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতনা, সেটি হল ঠোঁট, তাঁর ঠোঁট ছিল পুরু আর মোটা। ছেলে-

বেলা থেকেই মনে বিপ্লবের আগুন আর দেহে অসুরের শক্তি নিয়ে দিনে দিনে বাড়তে লাগলেন। তিনি জন্ম বিদ্রোহী তাই নেপোলিয়নের স্বৈরাচারকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না, বলতেন "That wicked man (Napoleon) has disgraced my father. I shall fight all my life against wicked men."

মার ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হোক, পণ্ডিত হোক। কিন্তু দ্যুমা লেখাপড়া দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। তবে সঙ্গীত শিখুক বিশেষ করে বেহালা বাজাতে শিখুক এতে তখনকার দিনে বেশ সম্মান আর পয়সাও ছিল। কিন্তু দ্যুমার ছিল সঙ্গীতের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। অবশেষে মা চেষ্টা করলেন আর কিছু না হোক পুরোহিত বা যাজক হোক। দ্যুমা রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে কয়েক দিন জঙ্গলে বসে রইল। এবার মা হাল ছেড়ে দিলেন। অবশ্য দ্যুমা যে কিছু ভালবাসত না তা সত্য নয়। একটি জিনিষ তিনি বাল্যকাল থেকেই গভীরভাবে ভালবাসতেন সেটি হচ্ছে লেখা। কিন্তু সে যুগে লেখকের খুব সম্মান ছিল না, আর লেখা সে তো অপদার্থদের কাজ এই ছিল সাধারণের ধারণা।

আলেকজান্দার বোকা নন। চোখে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত সন্ধানী দৃষ্টি, পৃথিবীর যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করবার মত উদার তাঁর মন। সমুদ্রের মত উদার মন আর বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যে জ্ঞান সঞ্চিত আছে তার মধ্যে ডুবে গেলেন। গ্রন্থকীট তিনি নন। তবুও বিশ্বের দ্রুত সঞ্চারমান প্রতিটি ঘটনা তাঁর নখদর্পণে এল অল্প দিনের মধ্যেই। এ সময় একটি ঘটনা তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। ১৮১৫ সালের জুন মাস। একদিন দ্যুমা দেখলেন রাজপথে এক বিরাট শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার আগে সৈন্যবাহিনী আর পেছনে ঘেরাটোপের মধ্যে দৃঢ়, ঋজু, ঔদ্ধত সম্রাট নেপোলিয়ন। ওয়াটারলু যুদ্ধে যাচ্ছেন। কিছুদিন পর আবার দেখলেন সে শোভাযাত্রা ফিরে আসছে—কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্য অন্তর্হিত। নেপোলিয়ন ফিরে আসছেন তাঁর সে ঔদ্ধত্য, ঋজুতা আর নেই, ভগ্ন, নুয়ে পড়া এক

দুর্বল মানুষের কঙ্কাল। নেপোলিয়ন পরাজিত, ক্লান্ত।

নেপোলিয়নের পতনের পর দ্যুমার মা আবার লুপ্ত সম্মান ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলেন। ছেলেকে বললেন পিতামহের অভিজাত পদবী ব্যবহার করতে। কিন্তু জন্ম বিদ্রোহী দ্যুমা রাজী হলেন না। দীনহীন দ্যুমা পদবী ব্যবহার করতেই তিনি বদ্ধপরিকর।

এবার বাস্তবের মুখোমুখী হলেন দ্যুমা। কি কাজ করবেন তিনি। অথচ কাজ না করলেও চলে না। সংসার চলবে কেমন করে। লেখাপড়াও বেশী করেন নি তবে হাতের লেখা মুক্তার মত সুন্দর। শেষ পর্য্যন্ত কেরাণী হলেন। কাজ দলিল নকল করা। ইতিমধ্যে মাথায় মস্ত বড় হয়ে উঠেছেন দ্যুমা। দেহে অফুরন্ত স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, মুখে চমৎকার মিষ্টি হাসি। কাজ নিয়েছেন সত্যি কিন্তু মোটেই মনোযোগ নেই। লেখার চাইতে পড়েন অনেক বেশী। ইতিমধ্যে ভল্টেয়ার প্রমুখ যাঁরা বিপ্লবের হোতা তাঁদের আগুন জ্বালা সব রচনা পড়ে শেষ করে ফেলেছেন।

হঠাৎ মনের গতি পরিবর্ত্তিত হল। দৈহিক সুষমায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েদের মন জয় করতে পারেন। এবার তাই করলেন। প্রথম শিকার অদেলি দালভিন নামে এক তরুণী। অল্পদিনের মধ্যে জয় হল করায়ত্ব। নিজের উপর বিশ্বাস হল আরও দৃঢ়। দ্যুমা গভীরভাবে ঝুঁকে পড়লেন এই দুর্দান্ত খেলায়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ডন জুয়ান হয়ে উঠলেন।

এবার মনে জাগল প্রচণ্ড উচ্চাশা। যা চান তাই যখন অবলীলায় জয় করতে সক্ষম তখন আর এই ছোট শহরে বসে থেকে কি লাভ। বড় শহরে গিয়ে যদি একবার নাম করতে পারেন তবে বিশ্ববিখ্যাত হতে আটকায় কে। আর অপেক্ষা নয় এবার প্যারিসে যেতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? মার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলেকে বিলাসের তীর্থ প্যারিসে যাওয়ার খরচ দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তবে ইচ্ছা

যেখানে তীব্র সেখানে উপায়ের জন্য আটকায় না। উপায়ও হল। অবসর সময়ে বিলিয়ার্ড খেলে দ্যুমা বেশ সুদক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন। এই দক্ষতাকেই কাজে লাগালেন এবার। বাজী ধরে খেলে অর্থ সঞ্চয় করতে লাগলেন। টাকা হল। রওযানা হলেন প্যারিস।

প্যারিসে এসে দ্যুমার সঙ্গে পরিচয় হল বিখ্যাত ট্র্যাজিক অভিনেতা টলমার আর তারই প্রচণ্ড উৎসাহে তিনি স্কটের 'আইভানহো'র নাট্যরূপ দিলেন কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করতে কোন প্রযোজক এগিয়ে এলেন না। অবশ্য এজন্য দ্যুমা নিরাশ হলেন না, একের পর এক নাটক লিখতেই লাগলেন। প্রত্যাখ্যানের পর প্রত্যাখ্যান তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করতে সক্ষম হল না। কোন প্রকাশক বা সম্পাদক প্রত্যাখ্যান করলে দ্যুমা হাসিমুখে বলতেন ধন্যবাদ মশাই, আমি অত সহজে বিফল হবার পাত্র নই। আমি আবার আসব।

অবশেষে ভাগ্যদেবী একটু প্রসন্ন হলেন। জনৈক প্রযোজক তাঁর Queen Christina of Sweden নাটকটি মঞ্চস্থ করতে রাজী হলেন। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন শেষ হয়েছে মহড়া চলছে, সবাই মনে মনে নাটকটির সাফল্য কামনা করছে, দ্যুমা নিজের মনেও আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে রয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদ সাধলেন তিনি নিজেই। ব্যাপার এই যে এক অখ্যাত লেখক সারাজীবন সাহিত্য সাধনা করেও ন্যূনতম সফলতা অর্জ্জন করতে পারেন নি। লেখক বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, তিনিও সুইডেনের রাণীকে নিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন বড় আশা মরবার আগে অন্ততঃ তাঁর এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে দেখে যাবেন। যদি দ্যুমার নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তবে তাঁর সে আশা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। দ্যুমা মহানুভব তিনি নিজের নাটক বন্ধ করে বৃদ্ধ লেখককেই সুযোগ দিলেন। বললেন "Let this poor fellow have his fling, before he makes his earthly exit."

প্যারিসে এসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল মারি ক্যাথরিন লাবে নামে

এক তরুণীর। এর পেশা পোষাক তৈরী করা। বিয়ে করলেন ড্যুমা। একটি ছেলেও হল। এই ছেলেটিও পরবর্তীকালে লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

ড্যুমা নতুন নাটক লিখলেন Henry III. প্রযোজক জুটে গেল। সবই ঠিক হল। ড্যুমা গভীর আগ্রহে প্রথম উদ্বোধন রজনীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ১৮২৮ সাল, ১১ই ফেব্রুয়ারী—ড্যুমার জীবনে স্মরণীয় দিন। প্রথম অভিনয় রজনী। সারাদিন ধরে নিজেকে সাজাবার জন্য বেছে বেছে পোষাক ঠিক করলেন। বিকাল থেকে সবাইকে তাড়া দিচ্ছেন যেন কোনমতে দেরী না হয়ে যায়। প্যান্ট, শার্ট, জুতা, মোজা সবই পরেছেন কিন্তু একি! জামার কলার কোথায়? তড়িঘড়িতে জামার কলার কিনতেই ভুলে গেছেন। হাতে সময়ও নেই যে বাজারে গিয়ে কিনে আনবেন। তাড়াতাড়ি পিজবোর্ড কেটে কলার বানিয়ে তাই পরে থিয়েটারে চলে এলেন।

থিয়েটার আরম্ভ হতে বেশী দেরী নেই। পর্দার ফাঁক দিয়ে ড্যুমা দেখলেন সারা হলে আর তিলমাত্র স্থান নেই। অভিনয় প্রচণ্ড সাফল্য বহন করে আনল। রাতারাতি সিতাসিত মিশ্রনেই এই যুবকটি কাগজের কলার সহ প্যারিস থিয়েটারের সম্রাট হয়ে উঠলেন।

সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ড্যুমার জীবনযাত্রা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। নিত্য নতুন নাটক, নব নব সাফল্য আর নিত্য নতুন নারী আর সুরা। নতুন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ড্যুমা মশগুল। সম্রাট দশম চার্লস এমন সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। প্যারিসের বুদ্ধিজীবিরা এ অন্যায় আদেশ মাথা পেতে মেনে নিল না। হল বিদ্রোহ। ড্যুমা বিদ্রোহে যোগ দিলেন। কলম ছেড়ে ধরলেন অসি। কিন্তু গর্জালেন যত তত বর্ষালেন না। বন্দুক চালানোর চাইতে চীৎকার করলেন অনেক বেশী। বিপ্লব মোটেই সাফল্যলাভ করল না। ড্যুমা আবার আরম্ভ করলেন নাটক লিখতে।

এবারের নাটক Antony. সারা প্যারিসের লোক ভীড় করে নাটক দেখতে এল। মেয়েদের ভীড়ে তাঁর জামা ছিঁড়ে একশেষ। বিপুল জনপ্রিয়তা। ড্যুমা এগিয়ে চললেন দুর্ব্বার গতিতে আপন সিদ্ধির পথে। ইতিমধ্যে একটি পুত্র জন্মেছে, প্রথমা পত্নী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছেন, মাঝে মাঝে বিপ্লবের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এইভাবে জীবনের বন্ধুর পথে চলছে অশান্ত পরিক্রমণ—আর এর মাঝেই চলছে লেখার কাজ, সৃষ্টির পালা। হঠাৎ তিনি স্থির করলেন তিনি ধর্মযাজক হবেন। কোন ওজর আপত্তিতে কান দিলেন না বললেন "Why not? I, the creator of a new drama, will become the founder of a new order" আবার হঠাৎ নিজের থেকেই মত বদলালেন "I had rather remain a pagan and pay the price" জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই শেষোক্ত মতবাদেই বিশ্বাসী ছিলেন ড্যুমা।

নারীর প্রতি ড্যুমার চিরদিনের দুর্ব্বলতা। তিনি মানুষের সঙ্গে মেলামেশা আমোদ করতেন কিন্তু নজর থাকত তাঁদের স্ত্রীর দিকে আর সুযোগ পেলেই তাদের প্রলোভিত করতে চেষ্টা করতেন। এজন্য অনেকস্থলে অপমানিত হলেও গায়ে মাখতেন না তিনি।

ড্যুমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ। কোন অবস্থাতেই তিনি হার মানতেন না। একবার এক ভদ্রলোক সোজাসুজি তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু বলুন তো। ড্যুমাও হটবার পাত্র নন, বেশ সপ্রতিভ ভাবেই তিনি উত্তর দিলেন "My father, was a Creole, my grand father was a Negro, and my great grandfather was a monkey My family, it seems, began where yours leaves off"

আর একবার ড্যুমার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যালজাক তাঁকে জব্দ করার জন্য বললেন "When my talent is used up, I shall write plays".

"Better begin at once, then" ডুমা মুখের উপর উত্তর ছুঁড়ে দিলেন।

১৮৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ডুমার নাটক Teresaতে প্রথম অবতীর্ণ হবে এক হাস্য লাস্যময়ী অপরূপা তরুণী। নাটক শেষ হল। জনতার উচ্ছল প্রশংসা শেষ হতেই নায়িকা গভীর আবেগে ডুমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। ডুমার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি তুলে ধরে বলল "আজ আপনার জন্যই আমার এই অভূতপূর্ব্ব সম্মান। বলুন কি করে আপনার এই অপরিসীম ঋণ পরিশোধ করতে পারি।" তরুণীর নাম ইদা ফেরিযার। স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে ডুমা বললেন "অতি সহজেই।"

এই ঋণ পরিশোধ করতে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হল তরুণী। ডুমাকে খুসী করতে সে সব কিছুই করতে রাজী, অবশেষে সবাইকে আশ্চর্য্য করে ডুমা তাকে বিয়ে করলেন। এবার ডুমার মধুকরী বৃত্তির অবসান ঘটবে সবাই আশা করলেন। কিন্তু কোথায়। যে কে সেই। ডুমা আবার নতুনের সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। অবশ্য স্ত্রীকেও তাঁর খুসীমত জীবন উপভোগ করার স্বাধীনতা দিলেন। "Live and let live" এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

নতুন আনন্দ, নতুন উত্তেজনা, নতুন বাহুবন্ধন, নতুন প্রশংসার পিছনে তিনি চিরকালই ছুটে চলেছেন। এবার যেন জীবন শুদ্ধ হয়ে আসছে, দুর্ব্বার গতিবেগ যেন অনেকটা স্তিমিত, বিপ্লবের আগুনও নিভে গেছে। এবার কি। এই তীব্র আবেগ আর উৎসাহকে ডুমা কি কাজে নিয়োজিত করবেন। অস্থির হয়ে উঠলেন ডুমা অবশেষে খুঁজে পেলেন পথ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এবার তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা স্থির করলেন। ইতিহাসের দুর্দ্দান্ত ঘটনা প্রবাহ, দুর্দ্দমনীয় জীবনযাত্রা আর অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিকে কল্পনার রঙে রঙিন করে বর্ত্তমানে পরিবেশন করলেন। এই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত ক্ষেত্র। রোমান্সের সম্রাট ওয়ালটার স্কট গত হয়েছেন। রোমান্সের পরিত্যক্ত সিংহাসনে নতুন করে নিজেকে

অভিষিক্ত করলেন আলেকজান্দার দ্যুমা।

প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস The Three Musketeers. ঐতিহাসিক তথ্য ও প্লট সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে আগষ্ট মাকেট নামে একজন সহকারী নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দ্যুমা তথ্যকে মোটেই প্রাধান্য দিতেন না। তাঁর কাছে ইতিহাসের dead facts এর চাইতে living truths এর দাম অনেক বেশী। তিনি নিজেই বলেছেন "It is permissible to violate history, on condition that you have a child by her"

অবিশ্রান্তভাবে লেখার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল দ্যুমার। ভোর সাতটা থেকে রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত একটানা তিনি লিখতেন, দুপুরের আহার্য্য অনেক সময় পাশেই থাকত স্পর্শ করতে ভুলে যেতেন। এই সময় কেউ দেখা করতে এলে একহাতে তাদের বিদায় জানাতেন অপর হাতে লিখতেন। কোন অবস্থাতেই লেখা বন্ধ করতেন না।

লেখার মধ্যে দ্যুমা নিজে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। এমন তন্ময় হতেন যে অনেক সময় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে সজীবতা অনুভব করতেন, এরা যেন রক্ত মাংসের গড়া মানুষ, এদের সঙ্গে আপনমনে কথা বলতেন, হাসি ঠাট্টা করতেন। একবার এক ভদ্রলোক দ্যুমার সঙ্গে দেখা করতে এসে দরজার বাইরে থেকে শুনলেন দ্যুমা অট্টহাসিতে ঘর কাঁপিয়ে তুলছেন। ভদ্রলোক ভাবলেন নিশ্চয়ই তিনি ভিতরে কারো সঙ্গে ব্যস্ত আছেন। চাকরকে বললেন—তোমার প্রভু নিরিবিলি হলে আমাকে খবর দিও আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। চাকর ত শুনে অবাক! বলে কি! আমার প্রভু ত একাকী। নিশ্চয়ই কোন সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে কথা বলতে শুনেছেন। ভদ্রলোকের ভুল ভাঙল। দ্যুমা দিনের পর দিন ঠিক এমনিভাবেই কাটাতেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন সারাদিন পরিশ্রম করেও তাঁর লেখায় কোন ক্লান্তির ছাপ পাওয়া যায় না কেন। দ্যুমা বলতেন "I don't produce my stories. The stories produce themselves within me."

যেমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল লেখার তেমন অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল মানুষের

সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের। অভ্যাগতদের জন্য, বন্ধুবান্ধবদের জন্য ড্যুমার বাড়ীর দরজা সর্বসময়ই অবারিত ছিল। তাঁর বাড়ীতে লাঞ্চের সময় ছিল দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত। বন্ধুবান্ধব আসছে যাচ্ছে। সব সময় যেন একটা উৎসব লেগেই রয়েছে। অনেকে অনিমন্ত্রিত কিন্তু তাহলেও আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই। ড্যুমা নিজে তাঁর উপন্যাসের নায়কদের মত রোমান্টিক জীবন যাপন ভালবাসতেন। এই অতিব্যয়ের ফলে তাঁকে শেষ জীবন পাওনাদারদের কৃপায় দিন কাটাতে হয়। উদারতার খেসারত দিতে তাঁর উপার্জ্জন সব শেষ হয় এবং আকণ্ঠ ঋণভারে ডুবে যান। তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই বেলিফকে দেখা যেত আর ফলে বড়ই উত্যক্ত বোধ করতেন ড্যুমা। একবার ড্যুমার এক বন্ধু এক সদ্যমৃত দরিদ্র ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার জন্য কিছু অর্থ সাহায্য চান। ড্যুমা পকেট থেকে পনেরো ফ্রাঁ তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মৃত ব্যক্তিটি কে। বন্ধুর কাছে যেই শুনলেন মৃত ব্যক্তি একজন বেলিফ অমনি আরও পনেরো ফ্রাঁ তার হাতে দিয়ে বললেন ও! বেলিফ। ঠিক আছে আরও পনেরো ফ্রাঁ দিলাম—দুজনকে কবর দিও।

যতই খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠছেন ততই ডুবছেন ঋণে। লিখলেন Monte Cristo কাঠামোতে রোমান্সের প্রাবল্য আছে সত্য কিন্তু বর্ণনার গুণে এবং চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় এত সজীব যে আজও অনেকে একে সত্য বলে ভ্রম করেন। ড্যুমা স্রষ্টা হতে চান নি তাঁর উদ্দেশ্য গল্প বলা—তিনি নিপুণ গল্পকার। লেখকের কাজ কি এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "write joyfully in order that his readers may live joyfully" যদি তা না হয় তবে পণ্ডশ্রম করে লাভ কি! কবিত্বের বা পাণ্ডিত্যের ভান তিনি করতেন না। তিনি গল্পকার, আশ্চর্য্য তাঁর গল্প বলার কৌশল। একবার এক সমালোচক তাঁকে বললেন "You write about events that you have never studied." ড্যুমাও ছাড়বার পাত্র নন তিনি উত্তর দিলেন "If I had studied events, when should I have

found time to write ?" শত্রুরা ব্যঙ্গ করে বলত ডুমা উপন্যাস তৈরীর ফ্যাক্টরী বসিয়েছেন। ডুমার সহকারী তাঁকে ইতিহাসের ঘটনা সংগ্রহ করে দিত আর সেই উপাদানকে তিনি কল্পনার আগুনে পুড়িয়ে জীবন দান করতেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বলা হয় Like the Arabian story teller who prolongs the vigil of his tribe under the starry sky of the desert. জীবনের শেষ ভাগে ঈর্ষার জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। অবশ্য এর পেছনে একটা আত্মতৃপ্তি বা গর্বের ভাবও ছিল। এ পরাজয় তাঁর নিজের ছেলের কাছে। তাঁর ছেলে Camille নামে এক নাটক লেখে এবং এর জনপ্রিয়তা ডুমাকেও ছাড়িয়ে যায়।

রঙ্গ-পরিহাস, এডভেঞ্চারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ডুমার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত বর্তমান ছিল। খ্যাতি এসেছে, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছেন কিন্তু যৌবনের সেই একগুঁয়ে, দুর্দান্ত স্বভাব একটুও বদলায় নি, যেখানে বিপদের গন্ধ সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। কোন বাধাই মানেন না। প্যারিসে ন্যাশনাল গার্ডে যোগদান, গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে যোগদান এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান সবই তাঁর দুর্দান্ত স্বভাবের ফল। এর জন্য অনেক সময় ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ১৮৪৮ সালে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের ফলে তাঁকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়।

বয়স ষাটের উপর। এখনও জীবনে ক্লান্তি আসে নি বরঞ্চ নতুনকে জানবার এক প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে মনে। কখনও জনৈকা সুন্দরী মার্কিন অভিনেত্রীর সঙ্গে রোমান্স উপভোগে মত্ত। কিন্তু হঠাৎ অভিনেত্রীটি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা গেল। ডুমার রঙিন স্বপ্নের ঘটল অবসান। আর নয়, বন্দরের কাল হল শেষ। ডুমা ছেলের কাছে ফিরে এলেন, বললেন "My boy, I have come to you to die"—বয়স তখন আটষট্টি। কলম রেখে শেষ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন ডুমা। তারপর

সব নীরব—বন্ধুরা এগিয়ে এসে পরীক্ষা করলেন সব শেষ। ১৮৭০ সালের ৫ই ডিসেম্বর। ছেলের বিশ্বাস হল না—এমন অপরাজেয় মানুষ মৃত্যুর কাছে মাথা নোয়াতে পারে না A mind such as my father's can never fell into a decline If he refuses to speak to us in the language of to-day, it is because he is learning to understand the language of eternity. হয়ত তাই ঠিক। ডুমা মরেন নি আজও বেঁচে আছেন অগণিত রসিকের মনে।

পাঠপঞ্জী—1. Living Biographies of Famous Novelists
By Henry Thomas & Dana Lee Thomas.

2. Cyclopedia of World Authors
ed, by Frank N. Magill.

3. বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকা।

'Emerging Concept of Social Education'

S. CHAKRAVARTI

The term "Social Education" is of recent innovation. To trace the history of emergent concept of Social education with special reference to the movement in India it is imperative to study it in the context of the world situations

Social education should be an education to make the people adjusted with the changing circumstances. In this particular context we are to judge the importance of adult literacy Reading and writing, the first criteria of adult education, was restricted in the begining to religious priests, clergyman and the like But the year 1450 evoked a new era in literacy when the art of PRINTING was first made known to the public by Johnes Guttenburg. Till the PROTESTANT REFORMATION the interpretation of everyday law was the right of catholic priests This protestant Reformation gave a fillip to literacy movement in the world by creating an awarness in the minds of the people to rise to the occasion. SUNDAY SCHOOLS started in England at that time also gave a new impetus in the literacy movement. Sunday-schools-movement was practically a cultural movement in the beginning—but later on these were utilised for literacy movements. Through these Sunday Schools we later on got the translated Bible in English from Latin.

Towards the end of the 18th Century the use of STEAM was invented. This helped upgradation of our civilisation The Industrial Revolution in England really brought abou a shifting of population from rural areas to urban areas. This mobility of population resulted in appreciating the art of reading and writing just to cope with the urban p ople In a village it was possible to become a good citizen though we might not acquire the art of reading and writing But in an industrial area an adult hardly can take advantage of the scientific discoveries if he does not equip himself with the 3 Rs the key to knowledge Not only from religious aspect but also from economic point of view literacy was essential in those bygone days In France Revolution too the literary and statesman like Miraboe, Roussoue, Voltaire understood that the peasantry would be subjected to pernacious propaganda if they were not made literate. We may, therefore, say that the France Revolution also initiated a movement in adult literacy.

After the 1st World War the actual literacy movement started in many parts of the world In the Army it was keenly felt that each and every soldier should be made literate.

It is in this context we are to judge the literacy percentage of different countries There is a popular criticism

that this movement has failed. But it is a fact that increase in literacy percentage depends on a dynamic leadership. Examples of Russia and Germany may be cited in this connection. In 1905 the literacy percentage in those countries was only 9% and in 1930 it rose to 90%. Turkey is also an example. Kamal Pasa of Turkey himself came in the field of making literate his fellow brethren. People got an unusual encouragement as soon as they found their leader with them. "Purtorico" is a small state in U.S.A. and is an example of raising her literacy enormously within the shortest time possible. Here, of course, the success is mainly due to technological changes in that country in spite of its being a democratic set-up. James Yen, a nationalist leader of China, after returning from Germany also started a campaign in China with 1000 basic chinese words.

An analysis of the above will speak for INDUSTRIALISATION and URBANISATION as the factors responsible for the growth of adult education. This resulted—a process of social disintegration, family disintegration, a sense of family and social insecurity—a feeling of isolated anomea—juvenile delinquency, slums, ill health etc.

In such circumstances a class of Social worker appeared before us just to give relief to those who have become the victims as a consequent to industrialisation. Gradually a way was found out to ameliorate the conditions through

COMMUNITY ORGANISATION in which both adult education and social work met together as social integration was our ultimate aim

In an under developed country like India the idea evolved in a different setting Practically the movement gathered together after the first world war From 1918 to 1936 there was sporadic attempts in different parts of the country as to the development of literacy classes. But in 1937 as soon as the popular Ministry took over charges of the country the adult education movement acquired a fresh impetus "The Congress Governments in the Provinces made efforts to spread literacy among adults and develop civic sense among the people"

"The out break of world war II spelt a set-back for the movement As efforts were concentrated on winning the war, adult education naturally suffered The political dead lock after 1942 and the increasing communal tension in the country made the situation worse" As a result of this, the number of adult schools declined considerably. But only in case of few States the intensive development of literacy was continued through the 'Compact area' scheme. Village libraries were subsidised under this Scheme.

This concept of adult education took a new shape just after attainment of Independance on August 15th 1947. The National Government felt it necessary to

formulate a plan and a system of education just after Independance. This was necessary just to ensure all citizens the opportunities to develop the qualities of leadership and these virtures which sustain a democratic way of life. The necessity of changing the concept was further augmented as soon as the decision of a country-wide basic education was adopted by the Government.

Generally, stages of development of a country, schooling facilities, peculiar circumstances or conditions under which a country changes over and the economic conditions are the factors responsible for changing the concept of adult education. Different countries have given different names and terminiology in this process of changing concept In India the people in the education line termed this old adult education as social education.

Poet Rabindranath and our father of the Nation—Gandhiji both of them conceived of education from new angles. Life-centric education as advocated by Tagore and the activity-education as conceived of by Gandhiji had a strong influence over the country. The constitution of an advisory board at the central level for education borrowed ideas from both Gandhiji's and Tagore's concept of education while formulating social education scheme in 1949.

Mere literacy plus a bit of general knowledge concept of the then adult education gave birth to a comprehensive

concept of Social education after the achievement of our Independance. A five-point programme to provide (1) literacy (2) knowledge of the rules of health and hygiene (3) training for the improvement of adults economic status (4) a sense of citizenship with an adequate consciousness of rights and duties and (5) healthy forms of recreation suited to the needs of the Community and the individual was formulated keeping in view the ultimate object of changing an illiterate citizen to a COMPLETE-MAN. Literacy is a means to an end was thought of by the thinkers in the field in this stage.

India is now free. Her teeming millions now will awake from two hundred years of slumber. A fulfledged picture of a fully developed man should be the objective. Emerging the social education concept from the old orbit of adult education is now a necessity and the country has placed before her that sacred task of upgrading a PARTIAL-MAN, to a COMPLETE-MAN. This (i e social education) will give him (i.e. the complete-man) "literacy so that the knowledge of the world may become accessible to him. It will teach him how to harmonise himself with his environment and make the best of the physical conditions in which he subsists. It is intended to teach him improved crafts, and modes of production so that he can achieve economic betterment. It also aims at teaching him the rudiments of hygiene both for the individual and the community so that our domestic life may be

healthy and prosperous. The last but not the least, this education should give him training in citizenship so that he obtains some insights into the affairs of the world and can help his Government, to take decisions which will make for peace and progress"—Moulana Azad.

This above comprehensive concept of social education further got a stimulus soon after the launching of First-Five-Year-Plan. The entire nation was suffering from many maladies - poverty - ignorance—ill health. Moreover, the adult population in India had to face he General Election on the basis of adult-franchise. This right of franchise—and to choose the best representative by vote brought about new notion in the minds of the planners to educate the illiterate adults not only in the 3 Rs but also to develop a civic sense—the key to democracy. Planners of Five Year Plan and the community development have thus aptly remarked 'Community uplift through community action' as the goal of social education.

Viewing of the objectives of Social Education in such a broadway was done keeping in view the socio-economic changes that the entire rural India will undergo under the impact of Five Year Plan particularly the programmes of community development. Conception of a separate functionary under the social education scheme of community development also beseplaks the broadening

vision of S. E from the standpoint of life-centric-education. "And in giving this education to the masses, greater use has been made of audio-visual materials, like charts, posters, filmstrips, films and broadcasts." This new idea of education and of utilisation of different aids was conceived of in a very planned way - an attempt which was absent in the adult - education programme of in those bygone days.

Countries like U. K., U. S. A., Japan, Germany etc. have evolved new ways of educating the people after a certain standard of literacy been achieved by the people. That is to say the content of adult education has changed according to the circumstances In India too the concept of social education is bound to change from time to time as soon as the country will undergo a rapid economic changes under the impact of technological improvements.

Our Secretary, Education, Ministry of Education has thus rightly observed that "Social Education programme must be pushed ahead vigorously, but care should be taken to see that their techniques do not become static. They have to be constantly adopted to the changing needs of national life and to be in harmony with the national ideology". Our concept of social education shall always evolve round the above principles and objectives.

——

পুস্তক পরিচয়

অসংলগ্ন ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ নিউলিট পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।

মূল্য—৩·০০ (তিন টাকা)

আধুনিক কবিতার পাঠক সংখ্যা সীমিত। দুর্বোধ্যতা না দুরূহতা এর কারণ তা নির্ণয় করা আরো দুরূহ। গল্প উপন্যাসের পাঠক সংখ্যাও নাকি দিন দিন কমে আসছে। সাহিত্যের এই নিশ্চিত দুর্দিনে পাঠক হৃদয়ে যে সাহিত্যরূপটি অবাধে সাম্রাজ্য বিস্তার করছে সেটি হলো রম্য রচনা। যাযাবর লিখেছিলেন 'দু'জন ইংরেজ একত্র হলে গড়ে একটা ক্লাব। দু'জন স্কচ একত্র হলে খোলে একটা ব্যাঙ্ক, দু'জন জাপানী করে একটা সিক্রেট সোসাইটি। দু'জন বাঙালী একত্র হলে করে কী? ...... স্থাপন করে একটি কালী বাড়ী।' বাঙলার সেই ভক্তি যুগের অবসান বোধ করি অনেক কাল পরেই ঘটেছে। এখন দু'জন বাঙালীর দরকার হয় না—একজন বাঙালীর হাতে কলম থাকলে তিনি একটি রম্যরচনা তৈরী করতে পারেন। জনৈক প্রখ্যাত অধ্যাপকের মুখে শুনেছিলাম যাঁদের আর কোন লেখার ক্ষমতা নেই তাঁরা নাকি একটা রম্যরচনা অন্ততঃ লিখতে পারেন। ব্যঙ্গ সুস্পষ্ট .....সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

রম্যরচনাকে আমরা যে রকম সাহজিক অর্থে গ্রহণ করেছি তাতেই এ ধরণের ব্যঙ্গোক্তির জন্ম হচ্ছে। ফলতঃ অচিরকালের মধ্যেই এর সম্পর্কে পাঠক সমাজে যদি তীব্র অনীহা জাগে তবে বিস্মিত হবো না। লেখকদের ধারণা সাময়িকপত্রের শূন্য উদরপূর্ণ করার জন্যে যা তা কিছু একটা লিখে দিলেই বুঝি তা রম্যরচনা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সাহিত্যের এই পরম রমণীয় রূপটি লেখকদের এ ধরণের অবজ্ঞা দাবী করে না। সহজকে শিল্প সুন্দর করে তোলা যে কি কঠিন তা শ্রেষ্ঠ রম্যরচনাগুলো পাঠ করলে অনুধাবন করা চলে।

গ্রন্থালোক

প্রশ্ন হবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অসংলগ্ন' কি রম্যরচনা? যে কোন মানদণ্ডে বিচার করি না কেন 'অসংলগ্ন'কে রম্যরচনার অনিন্দ্য সুন্দর দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করতে হবে। অসংলগ্নের এই শ্লাঘ্য আসন পাবার মূলে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের অভিনবত্বই কার্যকরী বলে মনে করি।

আপাততুচ্ছকে নিয়েই নাকি রম্যরচনার কারবার। প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু খুব অল্প ক্ষেত্রেই সেই কৌশল অবলম্বন করেছেন। তুচ্ছকে নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করলেও পথের শেষে প্রায়শই তিনি গভীরতার সন্ধানী। রচনার এই রীতিটি রবীন্দ্রানুসারী অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অতলান্তিক গভীরতা তাঁর নিকট পাবো না—কিন্তু মনে রাখতে হবে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সাগর থেকে ফিরেছেন 'আপনার গহন সত্য' গে জবাব অবসরই তিনি এখন চান।

অসংলগ্নের লেখক যে কবি তা আমাদের পূর্ব ঘোষণা পাঠ না করেও কুশলী পাঠক বলে দিতে পারবেন। কারণ কবি না হলে ভোরের কুয়াশা দেখে এমন 'স্বপ্নলু মায়ালু মতিভ্রমণু' অবস্থা হতে পারে না কিংবা, শহরের দেবদারু গাছগুলোর নতুন পাতা গজিয়েছে দেখে বিস্ময় চকিত হবারও হয়তো হেতু থাকতে পারে না। কিন্তু কবির নিঃসঙ্গ অনুভবগুলোকে ধরে রাখার জন্যে খুব বেশী ব্যস্ত সম্ভবতঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন না বরং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা—কল্পনা, সুবিধা অসুবিধা এবং সমস্যা নিয়ে আসর জমাতেই তিনি উৎসাহী। তাই দেখি 'ইংরেজী হটাও হিন্দী চাপাও নীতি' 'আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সাধারণ পাঠকের অভিযোগ,' কলকাতার জল সমস্যা, বাংলা উচ্চারণ বিধি, সংবাদ-পত্রের সম্পাদক সমীপেষু কিংবা পাঠক-পাঠিকার প্রশ্ন বিভাগ, আমাদের জীবনে যন্ত্রের বহুল আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অসংলগ্ন রচিত হয়েছে। অসংলগ্নের এই বিষয়বস্তু গৌরবে অবহেলা করার মতো নয়। রম্যরচনা অনেক ক্ষেত্রেই ভঙ্গী সর্বস্ব হয়ে ওঠে—প্রেমেন্দ্র মিত্র এর হাত হতে অসংলগ্নকে রক্ষার বহুল চেষ্টা করেছেন। অসংলগ্নের এই সাফল্য

অকিঞ্চিৎকর নয় বলেই আমাদের ধারণা। ফলতঃ পাঠকের সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ তিনি এখানে লাভ করতে পারেন।

অসংলগ্নের রচনাভঙ্গী সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয় তবে এর হার্দ্য ভঙ্গীর কথাই আমরা বলবো। পাণ্ডিত্যের গর্ব তাঁর কোনদিনই নেই, আছে মিত্রজনোচিত পরিহাসস্নিগ্ধ সরলতা। রম্যরচনার এই ভঙ্গীটি অবশ্যিই কাঙ্ক্ষণীয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভাষায় যে এক অদ্ভুত যাদু শক্তি রয়েছে এর প্রমাণ নতুন করে পাওয়া গেলো 'অসংলগ্নে'। নিম্নের দু একটি উদ্ধৃতি নিশ্চয়ই পাঠকের লোভ বৃদ্ধি করবে—"ট্রামের ত আজ-কাল মেঘ দেখলেই অযাত্রা, উইল না করে বাসে ওঠা সমীচীন নয়, আর সঙ্গতি থাকলেও ট্যাক্সির টিকি দেখতে পাবেন না। হ্যাঁ আছে বটে অধমতারণ বিপদ ভঞ্জন রিকশা কিন্তু সে ত সাগর ছেচতে ঝিনুক।"—এই উত্তরোল পরিহাস রসিকের হাতে আবার ব্যঙ্গের ঝাঁঝও কিন্তু কম ফোটে না—"পদ্ম যেখানে তাদের অনেকের ভূষণ সেখানে অন্য অনেক ভাষার শ্রীটুকুও বিরল।"

ভাষার এই যাদুতেই যদি তিনি পাঠকের হৃদয় হরণ করেন তবে আমরা কিন্তু বিস্মিত হবো না। বক্তব্য, ভঙ্গী ও ভাষার ত্রিবেণী সঙ্গমে 'অসংলগ্ন বাংলা রম্যরচনার জগতে একটি অসামান্য সংযোজন। এবং এর আস্বাদ দীর্ঘকাল পাঠক মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এ ভবিষ্যদ্ বাণীর দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম।

শ্রীর —

ঠগী ঃ শ্রীপান্থ : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। মূল্য—৫·০০

ইতিহাসের তথ্যাকীর্ণ প্রান্তরে সাধারণ পাঠকের (General reader) আনাগোনা খুব কম। একথা যে বাঙ্গালী পাঠককে স্মৃতিতে রেখেই বলছি তা মনে করার কারণ নেই—সব দেশের পাঠক সম্পর্কেই একথা সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। সাধারণ পাঠক যার অনুসন্ধান করে,—তারা যে সম্পর্কে

বিশেষভাবে কৌতূহলী তার যোগান ইতিহাস দিতে পারে না। সে জন্য প্রায় সব দেশেই গল্প উপন্যাস তাঁদের পাঠতৃষ্ণার মোটা অংশটা আদায় করে নেয়।

কিন্তু ইতিহাসের তথ্য ও বস্তুপুঞ্জ যে সকলের প্রাণেই ভয় উৎপাদন করে একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পুঞ্জীভূত ও নীরব বস্তুপুঞ্জের জগতে স্বেচ্ছায় অভিসার করার মতো দুঃসাহসীও কেউ কেউ রয়েছেন। সেই অভিসারীদের কেউ ঐতিহাসিক, কেউ ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটক রচয়িতা। কিন্তু আরেক দল রয়েছেন যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না, আবার ইতিহাসের উপাদানের সাহায্যে উপন্যাস বা নাটক রচনার কৃতিত্বও তাঁরা দাবী করেন না। বরং এ সকল উপাদানের সাহায্যে তৃতীয় একটা কিছু গড়ে তোলাবই তাঁরা পক্ষপাতী। শ্রীপান্থের 'ঠগী' ইতিহাস উপন্যাস ও নাটকের দক্ষ ও অভ্রান্ত সংমিশ্রণে তৃতীয় কিছু। শ্রীপান্থের 'কলকাতা' যাঁদের পড়া আছে তাঁদের নিকট শ্রীপান্থকে নতুন করে পরিচিত করতে হবে না। আমি শুধু শ্রীপান্থ এই ছদ্মনাম গ্রহণের তাৎপর্য সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতে অনুরোধ করবো। ইতিহাসের রুক্ষ প্রস্তরে পথিকবৃত্তি করে তিনি যে সম্পদ আহরণ করেছেন তাই উজাড় করে দিয়েছেন 'ঠগী' গ্রন্থে। কিন্তু সেজন্যে যে এর মানবরস ব্যাহত হয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ এ গ্রন্থে ইতিহাসরস এবং মানবরস একসূত্রে গাঁথা হয়েছে।

ঠগীদের ইতিহাসের সূত্রপাত মোঘলের পরাজয়ের এবং কোম্পানীর রাজত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী লগ্নে—সে বোধ হয় উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের কাহিনী। রাষ্ট্রবিপ্লবের সেই অসহায় অরাজকতার দিনে ঘর ছেড়ে যারা পথে বেরুতেন তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যেতো না —পথেই তাদের রহস্যময় অবলুপ্তি ঘটতো। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সেই অবলুপ্তির ইতিহাসের সূত্রপাত কিন্তু আরো তিনশ বছর আগে। তিনশ বছর পূর্বেও নাকি ভারতের বুক থেকে প্রতি

বছর গড়ে চল্লিশ হাজার মানুষ হারিয়ে যেতো। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষদের সম্পর্কে আমরা প্রায় নীরব হয়েই ছিলাম—সাপ, বাঘ, বা অজ্ঞাত কোন ব্যাধির হাতে ওদের সঁপে দিয়ে আমাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু যাকে দৈবদুর্বিপাকে বা ভবিতব্য বলে মনে করা হয়েছিল, পরিশেষে দেখা গেল এর পশ্চাতে সক্রিয় হয়ে আছে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম খুনীরা—এরাই ঠগী নামে পরিচিত। কর্নেল স্যার জেমস শ্লীম্যান হিসাব করেছেন যে ঠগীদের হাতে তিনশ বছরে অন্ততঃ দশলক্ষ মানুষ নিহত হয়েছেন। এই পরিসংখ্যানের সত্যতা সকলে স্বীকার করেন-নি তবে নিহতের সংখ্যা যে এরই কাছাকাছি তা কিন্তু অনেকেই স্বীকার করেছেন। ভারতের বুক হতে এতগুলো প্রাণীকে ওরা কিভাবে সরিয়ে দিয়েছিলো তা জানলে কিন্তু বিস্মিত হতে হবে। তাদের উপকরণ ছিলো অতি সামান্য। এই সামান্য উপকরণের সাহায্যে পৃথিবীতে যে, কী, বৃহৎ কর্ম সমাধা করা যায় তা জানবার জন্যে 'ঠগী' বইটি পাঠকদের পড়তে হবে।

অবশ্যি বইটি একবার হাতে নিলে প্রবল আগ্রহ নিয়ে একে শেষ করতে হবে ... ক বল, এদের সমাজে প্রচলিত শ্রেণী বিন্যাস, এদের বিশিষ্ট ধর্মমত, এদের গোষ্ঠী চ[illegible], সর্দারের প্রতি আনুগত্য, এদের সাঙ্কেতিক ভাষা ইত্যাদি সবকিছুই গভীর কৌতূহলোদ্দীপক। 'ঠগী', 'ভাগিনা' 'ম্যাক ফানসা', 'সাঙ্গাড়ে,' 'ধতুরিয়া' যে এক নয় তা হয়তো আমরা জানিনে। ঠগীরা মৃত্যুর পরওয়ানা জারি করে 'ঝিরনী' দিয়ে আর ভাগিনারা নৌকোর পাটাতনে তিনবার বৈঠা ঠুকে। হিন্দু মুসলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতো যে এরা ভবানীর সন্তান। এভাবে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এক ঐক্যমূলক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিলো। আর তাদের সাঙ্কেতিক ভাষা ও ক্রিয়াকর্ম বুঝতে হলে 'ঠগী' বইটি পড়া দরকার। ঠগীদের পথে বেরুবার আগে উদযাপিত অনুষ্ঠানগুলি যেমন, 'কোদাল পূজা,' 'নারকেল ভাঙ্গা,' 'গুড়ভক্ষন,' ইত্যাদির কোন তাৎপর্যই হয়তো আমাদের নিকট নেই কিন্তু এরা যে ভীতসন্ত্রস্ততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলোর অনুষ্ঠান করে তা জানলে আশ্চর্য হতে হয়। এদের ব্যবহৃত সঙ্কেত শব্দগুলি—পেলহু', 'সিক্কা,' 'বিল,' 'বিলহো' 'ভূকোত'

'লুগহা,' 'সোথা,' 'লুটকুনিযা,' 'নিসার,' 'টিক্কুর,' হয়তো পাঠককে অবাক করবার পক্ষে যথেষ্ট। এদের এ ভাষার নাম রামসী (Ramasee)। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মতো এও এক গূঢ়ার্থক সন্ধ্যা ভাষা।

এ হলো ঠগী গ্রন্থের একদিক। আরেক দিকে রয়েছে কুখ্যাত ঠগীদের অন্তরঙ্গ জীবন কথা। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বচঞ্চল জীবনের যে রূপ রেখাটি এখানে অঙ্কিত হয়েছে তা স্বতো-প্রশংসাযোগ্য। প্রত্যেকটি ঠগীর জীবনে যে প্রভূত হাসি অশ্রুর সমাবেশ রয়েছে তার সম্পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া হয় নি—এ দেওয়া সম্ভবও নয়। অসংখ্য ঠগীদের মধ্য হতে তিনি ফিরিঙ্গীয়াকে বেছে নিয়েছেন—তার চরিত্রের 'অরুগণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা'—তাই হয়তো এ নির্বাচনের প্রধান কারণ। কিন্তু তাকে যদি ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম খুনী বলেই মনে করি তবে কিন্তু অন্যায় করা হবে। বস্তুতঃ তার এমন হৃদয় যেখানে পরিমাণহীন হিংস্রতার পাশাপাশি অফুরন্ত ভালোবাসাও আছে। যে ফিরিঙ্গীয়া হাসতে হাসতে ঝিরনী দেয় শতশত মানুষের রক্তে যার হাত রঞ্জিত সেই আবার প্রেমে ডুবায়। 'স্লীম্যান' তার পত্নীকে আটক করে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলেন—নতুবা তাকে বন্দী করা এত সহজ হতো না—'স্লীম্যান' পরাজয়ের গ্লানি বহন করেই অ রেকবার ফিরে আসতেন। ঠগীদের সম্পর্কে এ গ্রন্থটি রচিত হলেও এ গ্রন্থের নায়ক কিন্তু এক ইংরেজ তনয়, নাম উইলিযাম হেনরী স্লীম্যান। উইলিযাম হেনরী স্লীম্যান কিন্তু 'ঠগী স্লীম্যান' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্থানের মাটিতে সৈনিক জীবন কাটাবার স্বপ্ন নিয়ে একদিন ভারতের বুকে পদার্পণ করেছিলেন স্লীম্যান। এরপর কযেক বছর কাটলো কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উন্মাদনায় রণক্ষেত্রের রণ দামামার কলকোলাহলে। সৈনিক স্লীম্যান কিন্তু সেই সংগ্রাম-নিরত জীবনেও আরেকটি জীবনের হাতছানি অনুভব করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লাইব্রেরীতে এক পুরণো বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি প্রথম জানতে পারেন অজ্ঞাত খুনীদের কথা। অজ্ঞাত খুনীদের সেই কাহিনী তরুণ ইংরেজকে যাদু করেছিলো। তাদের সম্পর্কে তাঁর অশান্ত

জিজ্ঞাসা সেদিনকার পরিচিত মহলে তাঁকে ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলেছিলো —তাঁদের সেই অবজ্ঞামিশ্রিত নামকরণ 'ঠগী স্লীম্যান'। স্লীম্যানকে সেই উপহাস সেদিন নীরবে সহ্য করতে হয়েছিলো। কিন্তু স্লীম্যানও বোধ হয় সেদিন জানতেন না যে ঠগীদমনের জন্যে তিনিই সেদিন ছিলেন একমাত্র প্রেরিত পুরুষ। এর পরের কাহিনী এক কর্মী পুরুষের। স্লীম্যান সেদিন যেন এক অদ্ভুত প্রাণাবেগ নিয়ে ঠগীদমনে নিরত হয়েছিলেন—একক প্রচেষ্টায় সেদিন তিনি প্রায় সমগ্র ভারতে কৌশলের জাল বিস্তার করেছেন, একের পর এক এসে সেই জালে ধরা পড়েছে। উপহাসের পাত্র স্লীম্যান ক্রমে ক্রমে সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন—'ঠগী স্লীম্যান' রূপে যার জীবনের সূত্রপাত তিনিই মরদেহ ত্যাগের কালে মেজর জেনারেল উইলিয়ম হেনরী স্লীম্যান। অবশ্যি মহামান্যা ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁকে 'স্যার' উপাধিও দিয়েছিলেন।

দুর্জয় সঙ্কল্পশীল স্লীম্যানের চরিত্রে আর একটি দিকও ছিলো - সে হলো, মমতা ও করুণায় পরিপূর্ণ প্রেমিক হৃদয়। তাই ঠগীদমনেই তাঁর প্রচেষ্টার সব অংশ ব্যয়িত হয়নি—এদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, এদের দাগী মনোভাব পরিবর্তনেও তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন। আর এতে 'বর্ণহীন পুরুষ' লর্ডবেণ্টিংকের সহযোগিতার হাত ছিলো সদা প্রসারিত। স্লীম্যান তাদের ধর্ম হরণ করেই নিশ্চিন্ত থাকেননি তাদের দিয়েছিলেন এক নবধর্মে দীক্ষা সে ধর্ম স্বাভাবিক মানুষের ধর্ম। সত্যিই স্লীম্যান ঠগীদমনের ইতিহাসে 'প্রেরিত পুরুষ।'

শ্রীপান্থের 'ঠগী' পড়তে পড়তে প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ হিন্দুস্থানের মাটি হতে শেষ ঠগীটিকেও বিতাড়িত করেছিলেন বলে স্লীম্যানের ছিলো দৃঢ় বিশ্বাস—ভয়ার্ত এলিজাবেথের কানে কানে 'ফিরিঙ্গী ঠগ' (স্লীম্যান) বলেছিলেন—যাকে বলার দরকার নেই এই বেচারাই হিন্দুস্থানের শেষ 'ঠগী।' কিন্তু স্লীম্যানের দূরদৃষ্টিও বোধ হয় জানতে পারেনি যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

ঘটে। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' কথাটি বোধ হয় আমাদের কালেরই সার্থক প্রবচন—স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষ সম্পর্কেই যথার্থভাবে প্রযোজ্য। ফলতঃ ঠগী লেখক শ্রীপান্থের নিকট পাঠকের বিনীত দাবী হবে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী স্বকালের ঠগীদেরও কালের দরবারে উপস্থাপিত করুক আর যেন ঠগীর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। কারণ, তাহলে সেটাই হবে আমাদের মহত্তর ট্র্যাজেডী।

—শ্রীর

আবর্তন ঃ -লেখক বিমল কর। অপরাধমূলক রহস্য কাহিনী। প্রকাশক—গ্রন্থপীঠ। মূল্য—৪৲ (চার) টাকা।

বাঙলা সাহিত্য জগতে শ্রীযুক্ত বিমল কর মহাশয়ের পরিচয় সমুজ্জ্বল। বিমল কর গাল্পিক ও ঔপন্যাসিক হিসেবেই—আমাদের নিকট পরিচিত হয়ে আছেন। শ্রীযুক্ত কর বিশ্লেষণ প্রধান এবং সমস্যা নির্ভর কথা সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে আমাদের মাঝে পরিচিত হয়ে আছেন। বস্তুত পক্ষে বর্তমান কালে উপন্যাসে ঘটনার উপস্থিতিকে কিঞ্চিৎ উন্নাসিক চোখে দেখার প্রবৃত্তিকে পরিলক্ষিত করতে পারি। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সকল কিছু উপাদানেরই মূল্য রয়ে গিয়েছে মনে করি। নূতন যুগের রীতি এই জগতের কারখানা ঘরে মানুষের আঁতের কথার উপস্থিতিই উপন্যাস ক্ষেত্রে আজ প্রশস্তি পেয়ে থাকে।

শ্রীযুক্ত কর এই উপন্যাসটির ভূমিকাতেই এ উপন্যাসে ঘটনার বিচিত্র মহিমার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। রহস্য কাহিনীতে যে কল্পনার আধিক্য বেশি তা সবাই স্বীকার করে নেবেন। শ্রীযুক্ত কর পাঠককে 'এই ক'টি কথা' স্মরণ রাখতে বলেছেন।

কিন্তু আমরা যে সব রহস্যপোন্যাসের সঙ্গে পরিচিত আছি তার সঙ্গে আবর্তনের কিছু পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্ত করের উপন্যাসে যে মনো-বিশ্লেষণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা আমরা আলোচ্য উপন্যাসটিতেও প্রত্যক্ষ করতে পারব। বেদনা বিষাদের গাঁথা স্বরূপ আমরা উপন্যাসটিকে

চিহ্নিত করতে পারি। উপন্যাসটি যখন পাঠক শেষ করেন তখন পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিছুটা অতৃপ্তিও বুঝি পাঠকের মনে উঁকি মারে।

আবর্তন রহস্যোপন্যাসের নায়ক সমীরণ মানসিক রোগের চিকিৎসক। ভদ্রলোক বিয়ে করে কর্মস্থলে ফিরে এসে শুনলেন সুনন্দা নামে তাঁর কোন পরিচিতা এবং এক সময়ে অন্তরঙ্গা বান্ধবীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে এবং সে অপরাধে পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করছে। স্বভাবতই সমীরণ তাঁর স্ত্রী নীলিমার কাছে বিষয়টি গোপন করলেন। ফলে যা হয় দু'জনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিল। সাহিত্যিক নাট্যকার বন্ধু ও রোগী অবনী তাঁর কাছে একটি গোপন খবর দিলেন যার ফলে সমীরণ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হয়ে ওঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসল অপরাধীকে চেনবার প্রবল ইচ্ছে তাঁর মনে জেগে ওঠল। তাঁর অধ্যাপক ও তাঁর উর্দ্ধতন অধিকর্তার নিকট হতে সহায়তা লাভ করলেন। তাঁর অধ্যাপক ডাক্তার ঘোষের বেশ হাত ছিল পুলিশ মহলে—সমীরণের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানবার পর স্বভাবতই তিনি ফোন করে পুলিশ অফিসারকে বলে সমীরণের কিছুটা সুরাহা করে দিলেন। পুলিশ সমীরণকে সন্দেহ করেছিল কারণ ঘটনার রাত্রে সমীরণ সুনন্দার বাড়ীতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন আর সুনন্দাকে একটি পোষ্ট কার্ডে জানিয়েছিলেন যে সেদিন তিনি সুনন্দাদের বাসায় যাবেন আর একটি প্রেসক্রিপসন যা তিনি সুনন্দার যন্ত্রণার সাময়িক বিশ্রান্তির জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর Boss ডাক্তার সর্বাধিকারী পুলিশকে বলেছিলেন যে একটা মানুষ পাগল না হ'লে কোন মেয়েকে হত্যা করে পরের দিন বিয়ে করতে যায় না। সমীরণ সুনন্দার বাবা ও মা যামিনীবাবু ও অংশুলতা মাসীমা বয়সের পার্থক্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন—কিন্তু অবনীর কাছ থেকে সব কথা জানবার পর তাঁর কাছে অনেক কিছু পরিষ্কার হ'য়ে গেল। যামিনীবাবু পাটনায় থাকতেন সে সময় নির্মলেন্দুবাবু যিনি অবনীকে এককালে তাঁর ভালবাসার মেয়ের বিনিময়ে সহায়তা করেছিলেন।

তিনি পাটনা গিয়েছিলেন থিয়েটার উপলক্ষ্যে সেই সময়ে যামিনীবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়—যামিনীবাবু বিপত্নীক। আশা মাসীমা তাঁর শ্যালিকা। আশামাসীমা এসেছিলেন অতিথিকে আপ্যায়িত করতে কিন্তু তারপর যা ঘটলো তাতে তাঁকে বিয়ে করলেন যামিনীবাবু। অন্তত: দুজনের ব্যবহার স্বামী-স্ত্রীর মত হলো। তাঁরা পাটনা ছাড়লেন। সুনন্দার জন্ম-কাহিনী তাই রহস্যাবৃত। নির্মলেন্দুবাবু অবনীকে বলেছিলেন যে সমীরণের মতন একটা মানুষকে রাত দশটার সময় বেড়িয়ে যেতে দেখেছেন। অপরাধী আসলে নির্মলেন্দুবাবু। সুনন্দার যেদিন যন্ত্রণার মত হয়েছিল সেদিন যন্ত্রণা লাঘব করতে সে থিয়োপেন্টাল সোডিয়াম ইনজেকশন ব্যবহার করতে চাইছিল কিন্তু সমীরণ নিজে সে ইনজেকশন নিয়েছিলেন আর তারপর তাঁর হাত থেকে সিরিঞ্জ পড়ে ভেঙ্গে যায়। সুনন্দাদের ওপরের ফ্ল্যাটে মাদ্রাজী ভদ্রলোক স্বামীনাথনের ছেলে রাজুর মারফৎ সমীরণ জানতে পারলেন যে ঘটনার রাত্রে তিনি ছাড়া আরেকজন বুড়ো ভদ্রলোক এসেছিলেন যিনি সুনন্দার ফ্ল্যাটে মাঝে মাঝে আসতেন। সে ভদ্রলোক দু'বার এসেছিলেন। নির্মলেন্দু সুনন্দাকে থিয়োপেন্টাল সোডিয়াম ইনজেকশন দিয়েছিলেন কিন্তু অতি মাত্রায় উত্তেজিত থাকাতে সে ইনজেকশনের মাত্রা বেশি হয়েছিল আর তাতেই সুনন্দা মারা যায়। সমীরণ যামিনীবাবুর দুটো নেশার কথা জানতো এক হোমিও প্যাথী দুই-জ্যোতিষ চর্চা। ঘোষ সাহেব তাকে বলেছিলেন দুটোই সাদা চোখে সরল কিন্তু সন্দেহজনক। পুলিশ অফিসার মুখার্জী যামিনীবাবুর অজ্ঞাত সূত্রটি অনেকটা বার করেছিলেন যাতে সমীরণ জানতে পেরেছিলেন যে যামিনী বাবুরও কোকেনের নেশা ছিল। কলকাতায় আসার পর লোকচক্ষুর অন্তরালে যামিনীবাবু নির্মলেন্দুবাবুর সাথে সম্বন্ধটি বজায় রেখেছিল। প্রিপারেশন এম এর সন্ধান পেয়েছিলেন সুনন্দার বাড়ী। সুনন্দা বোধ হয় অজান্তে এটি আনতেন। সুনন্দা তাঁর মানসিক দুঃখের কথা সমীরণকে বলতে হয়তো চেয়েছিলেন কিন্তু সব কথা বলা যায় না। তাই তিনি অজ্ঞানে

সব কথা বলতে চেয়েছিলেন শেষের সে দিনটিতে। সমীরণের বিয়ে করতে যাওয়াটা তাঁর কাছে চরমতম আঘাত তাই কিছুদিন বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন সুনন্দা কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। নির্মলেন্দুবাবুর রক্ষিতা অবনীর ভাষায় যে প্রায় স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছিলো তার বাসাতেই থাকতেন নির্মলেন্দুবাবু—যেখান থেকে সুনন্দাদের বাড়ী খুব দূরে নয়। নির্মলেন্দুর বিবেকের খোঁচার কথা মানতে চাননি সমীরণ। কিন্তু পুলিশ তাঁকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তিনি শেষ পথটি বেছে নিলেন যা হল আত্মহত্যা।

আশালতার (নির্মলেন্দুর তথাকথিত রক্ষিতা) কাতর ক্রন্দনে আর সুনন্দার স্মৃতি ভারাক্রান্ত হযে বইটি সমাপ্তি লাভ করেছে।

সমীরণ আর নীলিমার মাঝে আপাত বিরোধ অথবা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝিকে সহজেই দুটি মিলনে উৎসুক নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করতে সক্ষম হযেছে। স্ত্রী নীলিমা সমীরণের নিকট সমস্ত সত্তা স্বাভাবিক ভাবেই বিলিযে দিতে উদ্যত কিন্তু নিযতির নির্মম অট্টহাসি তাঁকে সমীরণের কাছ থেকে সামযিক ভাবে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। বিহ্বল অবস্থায় সমীরণ নিয়তির সম্মুখীন হযেছেন। অবনীর অযাচিত সহায়তা তাঁকে প্রথম সংশয়ান্বিত করেনি কিন্তু স্ত্রীর কৌতুহল তাঁকেও কৌতুহলী করে তুলেছিল। অবনী স্বাভাবিক ভাবেই কৌতুক অনুভব করেছিলেন—কিন্তু তিনি কারণটিও বলেছিলেন। সমীরণ আশামাসীমা ও যামিনীবাবু এ দুজনকেই সোডি-বাইকার্ব খাওয়ার অভ্যাস লক্ষ্য করেছিলেন। যামিনীবাবু নির্মলেন্দুর পাকচক্রে পড়ে নিজেও নষ্ট হযেছিলেন—এ দুজনই আশামাসীমাকে যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দেন। কোকেনের নেশা যামিনীবাবুরও ছিল। তিনি প্রিপারেশন এম এর আয়ত্বে এসেছিলেন এ তথ্য পরে প্রকাশ পেয়েছিল। নূতন জীবন আরম্ভ করতে যিনি উদ্যত হয়েছেন তাঁর সামনে এ দুর্বিপাক যে কি দুঃসহ তা সহজেই অনুভববেদ্য। কিন্তু দুঃসহ যন্ত্রণার মাঝে একটু আনন্দের স্পর্শ পেয়েছিলেন তাঁরা দুজন সমীরণ ও নীলিমা। অবনীই প্রথম যে কলকাতায়

নীলিমাকে নববধূর মর্যাদা জানিয়েছিলেন। নির্মলেন্দুর নেশার কথায় অবনী ও সমীরণ দুজনেই বিরক্ত সম্ভবতঃ তাঁদের হৃদয় বিষাক্ত হয়েছিল। যামিনীবাবু ও আশামাসীমার বয়স সম্বন্ধে অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সন্দেহ জাগে না আর তাঁরা যে পাকচক্রে জড়িয়েছিলেন তা বিশ্বাস করতে পাঠক মন বোধ হয় নারাজ হবে।

রহস্য কাহিনীটির করুণ সমাপ্তির কথা আমরা পূর্বে বলেছি। নির্মলেন্দুর শেষ পরিণতিতে আর কারো পরে না হোক আশালতার জন্যে ব্যথিত হই। রহস্য কাহিনীর সব চাইতে যা আকর্ষণীয় সে কৌতূহল এ কাহিনীতে শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে।

—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সরস্বতীয়াঃ—লেখক বিমল মিত্র। প্রকাশক—সুরভী প্রকাশনী মূল্য—৬.০০।

বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে সার্থক এবং অতি জনপ্রিয় লেখক হিসাবে 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এর লেখক বিমল মিত্রের নাম শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে নিঃসন্দেহে নির্বাচিত করা যায়। ছোট গল্প ও উপন্যাসে এই উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। 'সাহেব বিবি গোলাম' এর পর থেকে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই তিনি আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভাষা ব্যবহারে, চরিত্র চিত্রণে এবং মধুর সংলাপে আমরা বার বার মুগ্ধ হয়েছি। মানবচরিত্র অঙ্কনে লেখকের নিপুণতা আজ সর্বজন-স্বীকৃত। বিশেষতঃ নারী চরিত্রের রহস্য উন্মোচনে তিনি সমকালীনদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সার্থকতম। বিমল মিত্রের প্রতিটি উপন্যাসে এই নারী চরিত্র অঙ্কনের মুন্সীয়ানার পরিচয় আমাদের তৃপ্তি দান করেছে। তাঁর আলোচ্য উপন্যাস 'সরস্বতীয়া'য় যে নারী চরিত্রটির পরিচয় আমরা পাই তার স্বাদ একটু ভিন্ন। সাধারণ শহর জীবনের পোড় খাওয়া কৃত্রিমতা

সর্বস্ব মেকী সভ্যতার জান্তব প্রতিনিধি তিনি নন। নন তিনি কোন ঐতিহাসিক রোমান্সে ঘেরা অন্তঃপুরচারিণী—এ সরস্বতীয়া অতি সাধারণ দীন বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং এর পয়েন্টস মেন কদমকুয়ার ছেদি প্যাটেলের চুড়ি পড়া দ্বিতীয় পক্ষের ডৌকি রাজনন্দ গাঁর জেঠু রাউতের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ কুড়ি টাকায় কিনে আনা একটি সন্তান ধারণের যন্ত্র।

অতি আধুনিক উপন্যাসের ট্রামে, বাসে, রেস্তোরায় বা পাশাপাশি বাড়ীর কলেজী প্রেমের ন্যাকামী বা শহর জীবনের অতি শিক্ষিতের অকারণ মানসিকদ্বন্দ্বের একঘেয়ে সংঘাত এতে নেই। অতি সাধারণ অপাংক্তেয় মানুষের সুখ-দুঃখ, কামনা বাসনা, একটি সুখী পরিবার কল্পনা আর সহজ সরল মেয়ের হাসি অশ্রুর কাহিনী মধুর আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে। আজকের অতি আধুনিকতার দাবদাহে এ মিষ্টি কাহিনী পাঠকচিত্তে সামান্য শান্তির ছায়া দিতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

কাহিনীতে অল্প কয়েকটি চরিত্র। ছেদি প্যাটেল, তার প্রথমা স্ত্রী মুরলী আর দ্বিতীয় পক্ষের বউ সরস্বতীয়া এই তিন জনের কথাবার্ত্তা আর ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই কাহিনীর বিন্যাস।

ছেদি প্যাটেল সামান্য মাইনের রেলওয়ে পয়েন্টসম্যান। বিলাসপুরের লেভেল ক্রসিং এ সবুজ পতাকা দেখিয়ে গাড়ী পারাপার করাই তার কাজ। সাধারণ আর দশটা গরীব মেহনতী মানুষের মত তার মনেও আছে মাটির আকর্ষণ, ক্ষেতি ক্ষামারের স্বপ্ন। বদলীর জন্য এক মাসের মাইনে জলপানি খেতে ঘুষ দেয় এবং বদলীও হয় সে। গাঁয়ের কাছেই বদলী হল ছেদি প্যাটেল। স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি করল সরস্বতীয়া। সরস্বতীয়া চুড়ি পড়া ডৌকি সত্য কিন্তু সে কিছুতেই ছেদি প্যাটেলের সঙ্গে শোবেনা তার সন্তানের প্রতি লোভ নেই। কারণ ছেদি প্যাটেলের আছে পারা রোগ, প্রথমা স্ত্রী মুরলীকেও সেই রোগ ধরেছে। সরস্বতীয়া আর জেনেশুনে ও পথে পা দেবে না। উপন্যাসের মাঝামাঝি পথে আর

একটি নতুন মুখের আবির্ভাব—সে দেওকীনন্দন। রামলীলার দলে লক্ষণের পার্ট করে আর স্বপ্ন দেখে বোম্বে ফিল্মের। নারী হৃদয় জয়ের অনেক মারণাস্ত্রই তার হাতে। সহানুভূতিহীন বুভুক্ষু হৃদয় সরস্বতীয়া এ দুর্বার প্রলোভন জয় করতে পারলো না। দেওকীনন্দনের হাত ধরে রাত্রির অন্ধকারে অজানা পথে পাড়ি দিল। কিন্তু বিধাতার অভিশাপকে এড়াতে পারলো কি? সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ক্ষত নিয়ে আবার ফিরে এল ছেদি প্যাটেলরই ঘরে—ছেদি প্যাটেল তখন পারার ঘায়ে উন্মাদ—মুরলী যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে বেঁচেছে। বাঁচতে পারলো না সরস্বতীয়া ছেদি প্যাটেলের কাছে থেকে দূরে সরে গিয়েও—সার্থক হল না ছেদি প্যাটেলের স্বপ্ন- আজন্ম সঞ্চিত, তিলে তিলে গড়ে তোলা ক্ষেতি খামার ভোগ করার বংশধর এলো না তাদের সংসারে। ছেদি প্যাটেলের কাছে সরস্বতীয়ার ফিরে আসার পরই উপসংহার টেনেছেন লেখক। মানুষ নিয়তির হাতে পুতুল মাত্র—ভাগ্যকে কেউ এড়াতে পারে না—মুখবন্ধে সত্যনাথ রায় ,অ'র ন মাসীমার ব্যর্থ কাহিনীতেই লেখক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ছেদি প্যাটেল, মুরলী আর সরস্বতীয়াও সেই অন্ধ নিয়তিরই নিষ্ঠুর বলি।

চরিত্রগুলি স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত। সরস্বতীয়া সুন্দরী সরলা, লীলাচপল দেহাতী যুবতীর সার্থক আলেখ্য। হাস্যে, লাস্যে, ঝংকারে রক্তমাংসের সজীব মূর্তি হয়ে আমাদের সামনে ধরা দেয়। ছেদি প্যাটেলকে সে ভালবাসতে পারে নি এর পেছনে অন্য কোন মোহ নেই শুধু রোগের ভয় ছাড়া। অবশ্য ঘর সে ছেড়েছে তাও শহরের মোহের চাইতেও রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই। যখন সেখানেও বাঁচতে পারল না তখন অনুতপ্ত হয়ে ফিরে এল আবার ছেদি প্যাটেলরই কাছে।

ছেদি প্যাটেল সাধারণ গরীব মানুষ। যারা সুন্দর স্বপ্ন দেখে ক্ষেত-খামারের আর সন্তানের। মাটিকে তারা ভালবাসে আর ভালবাসে সহজ

সরল সাধারণ জীবন। তাদের কাছে মুক্তির চাইতে সংস্কার অনেক বড়। সরস্বতীয়ার প্রতি তার আকর্ষণ লালসায় পঙ্কিল নয় সে সরস্বতীয়ার রূপের জন্য বাতুল হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে আনে নি। সে চায় শুধু একটি সন্তান—তার উত্তরাধিকারী। সরস্বতীয়া সুন্দর কাজেই সন্তানও হবে সুন্দর এই কামনায়ই সে পাঁচকুড়ি টাকায় তাকে ডৌকি করে ঘরে এনে তুলেছে। অবশ্য প্রথমা স্ত্রী মুরলীর প্রবল আকাঙ্খাও এর পেছনে অনেকখানি কাজ করেছে। ছেদি প্যাটেল চরিত্রটি অত্যন্ত স্বাভাবিক সরল সাধারণ মানুষের চরিত্র। বাস্তব জীবনে এমন বহু চরিত্রের সন্ধান আমরা পাই।

মুরলী চরিত্রটিকে পাঠকের সবচেয়ে ভাল লাগবে। সর্বংসহা ধরিত্রীর মতই সে নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছে। নিজে সন্তান দিতে পারে নি সে ক্ষোভ তার আছে তাই সেই পছন্দ করে সরস্বতীয়াকে এনেছিল। স্বামীর প্রতি সে অনুরক্ত, বিধাতা তাকে রূপ দেননি কিন্তু এমন মানসিক সম্পদ দিয়েছেন যা আমাদের মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম। পারা রোগের যন্ত্রণায় সে শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করেছে তবু স্বামীর প্রতি কোন অনুযোগ নেই। আর সরস্বতীয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটি ভারী সুন্দর এবং উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অংশ সরস্বতী মুরলীর কলহ।......চরিত্রটির উপস্থিতি স্বল্পক্ষণের কিন্তু মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে।

উপন্যাসটির সহজ সরল সুর পাঠকের মনকে স্পর্শ করতে পারবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিমল মিত্রের কাছ থেকে আমরা বেশ কয়েকটি বড় উপন্যাস পেয়ে তৃপ্ত হয়েছি। এ উপন্যাসটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও স্বাদে এবং লেখকের বৈশিষ্ট্যে তৃপ্তি দান করবে। প্রচ্ছদপটটি ভারী সুন্দর।

— বিমল গুপ্ত

কিশোর বিভাগ

"চুরি"

লিটন রাও

ওমা একি, ব্যাপারটা কি, এ আবার কি জাদু!
ঘুমের থেকে উঠেই দেখি কাঁদছে মোদের দাদু!
এটা আবার কোন্ ছল তার, করছে নাকি রঙ্গ,
কিন্তু এমন ভোরবেলা রস করছে কেন ভঙ্গ?
তাড়াতাড়ি যাই ছুটে তাই মোদের দাদুর কাছে
'কি হয়েছে'—সুধাই তারে বলনারে মোর কাছে,
বারেক তরে থামিয়ে কাঁদা চেয়ে মুখের পানে
নিরালা কোণে আমায় টেনে বল্লে কানে কানে—
'কাল রাতেতে ছিলেম আমি রাজা ঘুমের ঘোরে
কে যেন আজ রাজাটা মোর নেয় গো চুরি করে।'

———

আজব খবর

শ্রীজিষ্ণুপ্রতিম দেব

'শোন্ শোন্ যাস্ কোথা
বুট পরে তুইরে,
—মহাজ্বালা তোরে নিয়ে
এ যে মহা দায়রে !
আয় দেখি, শুনে যা—
কথা আছে বল্‌বো
তারপর এক সাথে
মাঠপানে চলবো ।'
'কি কথা ?—দেরী হলো—
পরে এসে শুনবো,
ও পাড়ায় ম্যাচ আছে
হাফব্যাকে খেলবো ।'
'আরে দাঁড়া, মাথা খাস্
এখুনি যে চল্লি—
গনশার ও বাড়ীর
কথা কিছু শুনলি ?
মাঠে ঘাটে বাজারেতে
লেগে গেছে জটলা,
খবর আজব বড়ো ;
জানিয়েছে পট্‌লা ।
শোন্ তবে মূল কথা
গন্‌শার কুকুরে,
দুটো ছানা পেড়েছে রে
কাল ঠিক দুপুরে ।'

একটি দুষ্টু ছেলের কাহিনী

"মধুকর"

না বাড়ীতেও সে আসেনি। বন্ধুরা হতভম্ব! গেল কোথায়? সবাই মিলে চারদিকে খোঁজাখুজি শুরু করে দিল। স্কুলের মাঠ, বাজার সবই দেখা হল তন্ন তন্ন করে, না কোথাও ওর পাত্তা নেই। 'কি বিচ্ছু ছেলেরে বাবা'—ছেলেরা বলাবলি করতে করতে যে যার বাড়ী চলে যায়।

পরদিন আবার স্কুলে এল সেই বিচ্ছু ছেলেটি। সহপাঠীরা সবাই মিলে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ওকে পাগল করে দিতে চাইল। একজন আবার বুদ্ধি করে হেড মাষ্টারের কাছে নালিশ জানিযে এল-স্যার ডেভি এসেছে।

তলব পড়লো হেড-স্যারের ঘরে। ডেভির ক্লাশ টীচারও সেখানে আছেন। হেড-মাষ্টার স্বভাব সুলভ গম্ভীর মুখে আরও একটু গাম্ভীর্য্য এনে বসে আছেন। ক্লাশ টীচার নাম ডাকার খাতায দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন, কবে কবে ডেভি ক্লাশ পালিযেছে তার একটা হিসেব করতে।

"ক্যাচ" করে একটা শব্দ হল। দু পাল্লার দরজাটা খুলে ডেভি এসে ঢুকলো ঘরে। ভাবলেশহীন মুখ তার। সামনে যে এত বড় একটা বিপদ, সে সম্বন্ধে মোটেই তার চিন্তা নেই বলে মনে হয়। প্রধান শিক্ষক মশাই তার পড়াশোনার অমনোযোগিতা ও অলস প্রকৃতির জন্য একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। ডেভির দৃষ্টি তখন খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে ছড়িয়ে পরেছে। ভাবখানা হচ্ছে—বক্তৃতা শেষ করে আমার পাওনা শাস্তিটা দিযে দিন স্যার—আমি পালিযে বাঁচি।

এ সব ব্যাপারে ও এমন অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল যে সে জানতো দু'রকম শাস্তি পেতে হয় এ কাজ করলে। এক নম্বর—নিজের কান দুটো নিজ হাতে আচ্ছা করে মলে দেওযা। দু নম্বর পিঠে বেত খাওযা। এ শাস্তি প্রায় রোজের পাওনা ওর।

কেউ ভালোবাসতো না বোধ হয় ডেভিকে। পড়াশোনার ব্যাপারে যেমন লবডঙ্কা চেহারাটিও তার ছিল ঠিক তেমনি। রীতিমত কুৎসিত বলা চলে। গলার আওয়াজটা ঠিক রাজহাসের মতো কর্কশ। কিন্তু যে কাজের জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হত তা সে মোটেই ছিলনা। ডেভিকে আর যাই বলা যাক্ অলস বলা যায় না তাকে। পড়াশোনা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। গ্রীক, ল্যাটিন ভাষার কচকচি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতোনা সে। অঙ্ক শেখাতেও তার অনিচ্ছা ছিল প্রবল। 'দুয়ে আর দুয়ে চার' কি প্রয়োজন এটা জানার, যারা জানেনা তারা কি সংসারে বেঁচে আছে না?—অনেকটা এই রকম ছিল তার মনোভাব।

কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে তাদের জন্য পদ্য রচনায ও গীতি কবিতার সৃষ্টিতে তার মোটেই অনিচ্ছা ছিলনা। যখন তখন সে পদ্য রচনা করে ফেলতো। পাড়ায় বা স্কুলে নাটক হলে সবার আগে এগিয়ে আসতো ডেভি।

এটা গেল তার চরিত্রের একদিক আর একটা গুণও ছিল তার। যা এই রকম প্রকৃতির ছেলেদের কাছে আশা করা যায় না। প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তার প্রচুর। কি করে বাতাস বয়, সমুদ্রে ঢেউ উঠে কেন, এত উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো কি করে দাঁড়িয়ে আছে—এমনি ধরণের সব প্রশ্ন দিনরাত তার মাথায় ঘুরে বেড়াত। আর সে সব প্রশ্নের সমাধানের আশায় সমুদ্র উপকূল দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়াত; কোন নাবিক বা খনির শ্রমিককে দেখলেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে বিব্রত করে তুলতো।

এবার এই বিচিত্র চরিত্রের ছেলেটির নাম তোমাদের বলবো। শুনে চমকে ওঠোনা যেন—এর নাম হচ্ছে স্যার হাম্ফ্রি ডেভি (Sir Humphry Davy). কি চিনতে পারলে না? বলো কি! আচ্ছা এ নাম না শুনে থাক, 'ডেভির সেফটি ল্যাম্প'—(Davy's Safety Lamp) একখানি

শুনেছ তো? কয়লার খনি থেকে শ্রমিকেরা কি করে কয়লা তুলে তা তোমরা জানো। খনির ভেতরে এমন সব গ্যাস থাকে যা সামান্য একটু আগুনের সংস্পর্শে এলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে আর বহুলোক মারা পড়ে। কিন্তু আলো না নিয়ে তো অন্ধকার খনিতে নাবাও যায়না। হাম্‌ফ্রি ডেভি অনেক পরিশ্রম করে এমন এক প্রকার বাতি তৈরী করলেন যা আলোও দেবে আবার গ্যাসের সংস্পর্শে বাতির আগুন আসতে পারবে না। 'ষ্টীম ইঞ্জিন' আবিষ্কর্তা জর্জ ষ্টিফেনসন্‌ও ঠিক তারই মতো 'নিরাপত্তা বাতি' একই সময়ে তৈরী করেছিলেন।

ডেভির 'নিরাপত্তা বাতি' খনির মালিকদের ধন-সম্পদ ও শ্রমিকদের প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি এনে দিল। কৃতজ্ঞ মালিকরা একটা চমৎকার রৌপ্য নির্মিত উপহার ডেভিকে প্রদান করেন। বিরাশি জন শ্রমিক এক পত্রে সই করে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানান। সেদিনের স্কুলের সেই দুষ্টু ছেলে ডেভি কি করে এত বড়ো কাজ করলো তা ভেবে তোমরা অবাক হচ্ছ। অবাক হবার কথাই। কি কঠোর পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের ভেতর দিয়ে স্কুলের ডেভি স্যার হাম্‌ফ্রি ডেভিতে পরিণত হল এবার তাই বলবো।

ডেভির জন্ম হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। তিনি তাঁদের পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ডেভিরা দু' ভাই তিন বোন। তাঁর মা ছিলেন খুব কর্মঠা। কিন্তু সংসারের যে কর্ণধার অর্থাৎ ডেভিডের পিতা ছিলেন নিতান্তই অলস প্রকৃতির এক মণ্ডপ। তিনি কাঠখোদাই এর কাজ খুব ভালো জানতেন, কিন্তু কোনদিন সংসার প্রতিপালনের ব্যাপারে তা কাজে লাগান নি। ছোটখাট একটা সম্পত্তিও ছিল তাঁর কিন্তু প্রচুর মদ পান করে কিছু দিনের মধ্যেই সব উড়িয়ে বুড়িয়ে দিলেন। পনের বছর বয়সে ডেভির স্কুলের পড়া শেষ হয়। ঠিক তার এক বছর পরেই তার পিতার মৃত্যু হয়। অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ডেভির মা অকূলে ভাসলেন। নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে

ডেভির বোধ হয় চৈতন্য হয়। কিন্তু এখন কি উপায়। জন টন্‌কিন (John Ton Kin) নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডেভির পরিবারকে খুব ভালো-বাসতেন। ডেভিরাও তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতো। তিনি তাঁদের সবাইকে নিয়ে আগের জায়গা ছেড়ে (Penzance) চলে এলেন। ডেভির মা এখান থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করে একটা টুপীর (মেয়েদের) দোকান খুলে বসলেন। ভেসে যাওয়া পরিবারটা আবার উঠে দাঁড়ালো জন্ টন্‌কিন এর সাহায্যে। ডেভিও এবার উঠে দাড়ালেন পড়াশোনা করে মানুষ হবার জন্য। এক শল্য চিকিৎসকের (Surgeon) অধীনে ডেভি শিক্ষানবিসী শুরু করে দিলেন। তখন তাঁর সাধ ছিল 'কেমিষ্ট' (Chemist) হবার। কিন্তু তাঁর অন্য পরিকল্পনাও ছিল। যার জন্য একই সঙ্গে তিনি ভূগোল, শারীর-বিদ্যা (Anatomy) পদার্থ-বিদ্যা এবং প্রায় দুটি বিদেশী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। বিখ্যাত উপদেশাবলীও তখন তার পড়াশোনার অন্তভুক্ত ছিল।

প্রায় তিন বছর ডেভি উক্ত চিকিৎসকের অধীনে শিক্ষানবিসী করেন এই সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি কয়েকটি গবেষণাও চালিয়েছিলেন। (একটি নতুন তথ্যও তিনি এ সময় আবিষ্কার করেন তা হল—দুইটি বরফের টুকরো যদি এক সঙ্গে ঘষা খায়, তবে যে তাপ উৎপন্ন হবে, তার ফলে ঐ বরফের টুকরো গলে যেতে পারে)। শিক্ষানবিসীর সময় অনেক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে ডেভির বন্ধুত্ব হয়। তার মধ্যে জন বেডোস (John Beddoes) বলে এক গবেষকও ছিলেন। তিনি ব্রিষ্টলে (Bristol) 'Pneumatc Institute' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলার মনস্থ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটি স্যানেটোরিয়াম, যেখানে অসুস্থ লোকেদের গ্যাস শুঁকিয়ে সুস্থ করার প্রচেষ্টা চলতো। এটি পরিচালনার জন্য বেডোসের একজন লোক দরকার ছিল। তিনি ডেভিকে এ কাজের ভার দিতে চাইলেন। ডেভিও সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মায়ের নামে লিখে দিয়ে বেডোসের

কাজে নিশ্চিন্ত মনে আত্মনিয়োগ করলেন। চিকিৎসা বিদ্যায় পড়া তিনি শেষ করবেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে গভীর ভাবে পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজের তালিকাটা এখানে তুলে দিচ্ছি—এটা দেখলেই বুঝতে পারবে কি পরিশ্রম করতেন তিনি—

সকাল ছটা থেকে আটটা—	লেখার কাজ।
,, নটা থেকে বারোটা —	গবেষণা
বিকাল চারটা থেকে ছটা—	সাধারণ পড়াশোনা
সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটা—	গবেষণা সংক্রান্ত পড়াশোনা।

জন বেডোস এক সময় অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তাঁর মতো চমৎকার লোক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যেত। তার পরিবারটিও ছিল বেশ হাসিখুসী মিষ্টি পরিবার। বেডোস ডেভির কয়েকটি গবেষণা সংক্রান্ত কাগজ পত্র তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে দেখেন। তিনি সেগুলো আগ্রহ নিয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হল লেখাগুলো মূল্যবান—তিনি এগুলো প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে ফেল্লেন।

কিন্তু অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ এগুলো পড়ে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। তাঁরা বল্লেন বাড়ীতে প্রস্তুত যে সমস্ত যন্ত্র নিয়ে উনি কাজ করেছেন সে গুলো ছিল ত্রুটীপূর্ণ—যার ফলে আবোল-তাবোল ফলাফল পেতে হয়েছে। ডেভি কিন্তু এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হলেন না।

১৭৯৯ সালে ডেভির জীবনে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো। একটি হল তাঁর প্রথম ইংলণ্ড ভ্রমণ। আর দুনম্বর নাইট্রাস অক্সাইড (Nitrous Oxide) সংক্রান্ত সুদীর্ঘ দিনের গবেষণার শুরু। নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসটি কিন্তু খুব মারাত্মক গ্যাস, এই গ্যাস কোন রকমে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, মাতালের মতো

হাসে নাচে, লাফায়। যার জন্য এর আর এক নাম 'লাফিং গ্যাস' (Laughing gas)। খুব বেশী পরিমাণে গেলে মানুষ মারাও যায়। এই গ্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে ডেভিরও একবার প্রাণসংশয় হয়েছিল। ডেভি গবেষণার শেষে এই তথ্য বের করলেন যে অল্প পরিমাণে এই গ্যাস যদি নাক দিয়ে টেনে নেওয়া যায় তবে আস্তে আস্তে লোক অচৈতন্য হয়ে পড়বে এবং তখন তার কোন যন্ত্রণা বোধ থাকবেনা। কিন্তু এ আবিষ্কার কোন কাজেই লাগেনি তখন। প্রায় চল্লিশ বছর পরে দাঁততোলার ব্যাপারে ও অন্যান্য অপারেশনে ডাক্তাররা এর ব্যবহার আরম্ভ করেন। ডেভি তখন ইহ-জগতে নেই।

কাউন্ট রামফোর্ড (Count Rumford) নামে বেডোসের জনৈক উৎসাহী বৈজ্ঞানিক বন্ধু জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা সমাধানের বস্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে একটি গবেষণাগার এই সময় স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটিই পরে রয়েল ইনষ্টিটিউট (Royal Institute) নামে খ্যাত হয়। ডেভি এই রসায়নাগারের পরিচালক ও সহকারী লেকচারারের পদ লাভ করেন। তাঁকে বছরে একশ পাউণ্ড, থাকবার একটি ঘর উপযুক্ত জ্বালানি আর মোমবাতি পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হত। এই সামান্য বেতনের জন্য তিনি ধৈর্য্য হারাননি। নিজের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, বয়সও ছিল কম। সুতরাং তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৮০২ সালে ডেভি রসায়নের অধ্যাপক হলেন, ঠিক তার পরের বছরই তাঁকে রয়েল সোসাইটির ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। উক্ত সোসাইটির সেক্রেটারীর পদটিও পরে তিনি লাভ করেন। লেকচার থিয়েটারে তাঁর বক্তৃতা কালে হলটিতে তিলধারণের স্থানও থাকতোনা। এ সম্বন্ধে তাঁর বন্ধু যা বলেছেন তা হচ্ছে "The admiration which his lectures obtained, can scarcely be imagined. Old and young eagerly crowded the room."

একমাত্র ডেভির জন্য ইনষ্টিটিউটটি টিকে থাকে। জনসাধারণ কাউন্ট রামফোর্ডের পরিকল্পনা ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল, এদিকে রামফোর্ডও তাঁর মেজাজ ঠিক রেখে তাদের সঙ্গে চলতে পারছিলেন না, যার ফলে তাঁকে দেশে চলে যেতে হয়। আর কোনদিন ফিরে আসেননি তিনি।

১৮১২ সালে ডেভি রয়েল ইনষ্টিটিউটের কাজে ইস্তফা দেন এবং সে বছরেই তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হল এখন স্যার হামফ্রি ডেভি (Sir Humphry Davy) এই বছরেই মিসেস এপ্রিস (Mrs Apreece) নামে এক ধনবতী বিধবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর (Mrs. Apreece) কল্যাণেই গবেষণা কাজে আরও সময় লাগাবার সুযোগ তিনি পান। তাঁর স্ত্রীর সাহায্যে তিনি বহুমূল্যের যন্ত্রপাতি কেনেন। স্ত্রী ধনে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে তাঁর মনে কিন্তু কোন গ্লানি ছিলনা। তিনি তাঁর বাল্যজীবনের নিরানন্দ স্মৃতি হৃদয় থেকে মুছে নিতে চাইছিলেন।

ইলেকট্রিক ব্যাটারী (Electric battery) তৈরী করা নিয়ে অনেক-গুলো গবেষণা চালানোর সময়, ডেভি তাঁকে ফ্রান্স যেতে দেবার প্রার্থনা জানিয়ে সরকারের কাছে পত্র পাঠান। ইংলণ্ড এ সময় নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তবু বিজ্ঞান সাধক ডেভির প্রার্থনা না মঞ্জুর হলনা। তিনি, তাঁর স্ত্রী ও বন্ধু মাইকেল ফ্যারাডেকে নিয়ে ফ্রান্সে চলে আসেন। এটি ছিল ডেভির বিজয় অভিযান। কারণ এ অভিযান তাঁকে "নেপোলিয়ন প্রাইজ" দিয়ে ভূষিত করে। দেশে ফিরে এলে 'ডাবলিন সোসাইটি' (Dublin Society) তাঁকে দু প্রস্থ বক্তৃতার জন্য এক হাজার পাউণ্ড দান করেন।

১৮১২ সালের কয়লাখনির ভয়াবহ দুর্ঘটনা সমস্ত পৃথিবীকে সচকিত করে। এর প্রতিবিধানের ভার ডেভিকে দেওয়া হয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে

কাজ চালিয়ে ডেভি আবিষ্কার করলেন সেফটিল্যাম্প। যা ডেভিকে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখলো।

১৮১৮ সালে তাঁকে 'Baronet' উপাধি দেওয়া হয় এবং ১৮২০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য কোন সময়েই ভাল ছিলনা, এখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবার উদ্দেশ্যে তিনি দূর বিদেশে দু'বার ভ্রমণে যান। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। মাত্র একান্ন বছর বয়সে জেনেভাতে এই বিজ্ঞান সাধকের মৃত্যু হয়। সেদিনটি ছিল ২৯শে মে ইংরেজী ১৮২৯ সাল।

উয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবে (Westminster Abby)তে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি ফলক রাখা হয় আর শৈশবের লীলাভূমি পেন্‌জান্সে একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। বিদ্যুৎ শক্তি ডেভির নিরাপত্তা বাতিকে অচল করে দিলেও ডেভির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বর্তমানেও ডেভির বাতির অনুসরণে অনেক রকম বাতির সৃষ্টি হয়েছে যা গ্যাসের অস্তিত্ব প্রকাশে সাহায্য করে। ডেভি এখনও অমর, চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন মানুষের মনে। তাঁর সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা প্রচলিত আছে তাহল "Sir Humphry Davy was not only one of the greatest, but one of the most benevolent of man"—এর চেয়ে বড় সম্মানের কথা আর কি হতে পারে ?

———

বীরেন্দ্রচন্দ্র সাধারণ গ্রন্থাগার
২৭. ৪. ৬৪ ইং

আমার কিশোর/কিশোরী বন্ধুরা,

এ মাসের চিঠি লিখতে গিয়েই মনে পড়লো মহাকবি শেক্সপীয়ারের কথা। ইংরেজী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিভাদীপ্ত কবির জন্ম হয়। সুতরাং এ বছর তাঁর চতুর্থ জন্ম শতাব্দী পালিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব দেশের মতো বাংলাও এই পূণ্যদিনটিতে স্মরণ করেছে তাঁর কথা। শেক্সপীয়র সাহিত্য প্রভাব বাঙ্গালী জনজীবনেও অনেক আগেই বিস্তার লাভ করেছিল। সাহিত্যের দরবারে যাঁরা স্থান লাভ করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোন না কোন রকমে এই মহাকবির কাছে ঋণী। একটা আশ্চর্য্যের কথা কি জানো কবির প্রতিভার আলোক ছটায় সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে থাকলেও তাঁর জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন্ অন্ধকারে তা লুকিয়ে আছে কেউ জানেনা। অত বড় একজন কবির এই সংযম সত্যি অবাক হবার মতো।

২৫শে বৈশাখ ১৩৭১ বাং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী। তোমরা সবাই হয়তো দেখেছ এই দিনটিকে সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য আমরা 'রবীন্দ্র স্মৃতি প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করেছি। অনেকে এতে সাড়া দিয়েছ, বিশেষ করে তোমাদের কাছ থেকে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার দেখা পেয়েছি তাতে আমরা সবাই আনন্দিত। সরস্বতীর মানস ভোজসভায় তোমরা আরও ভালো অংশ নেবে সে কামনাই করছি। 'গ্রন্থালোকে' পরবর্তী সংখ্যা '২৫শে বৈশাখ সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশ হবে বোধহয়। এই সংখ্যায় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাগুলি প্রকাশিত হবে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের চিঠি এখানেই শেষ করলাম।

ইতি— তোমাদের মিতাভাই।

আমাদের কথা

'আমাদের কথা' লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি এমন একলগ্নে যখন 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত' হয়ে ওঠছে শেকস্‌পীয়রের ভাস্বর কীর্তি গাথা। 'আমাদের কথা' আমাদের মানুষটির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়ে ধন্য হোক। শেকস্‌পীয়র প্রসঙ্গে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ যোগ্যতর মন্তব্য করবেন, বিশেষজ্ঞগণ তা নিয়ে পুনরায় বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হবেন এভাবেই হয়তো নতুন করে শেকস্‌পীয়র আবিষ্কৃত ও পঠিত হবেন। শেকসপীয়রকে অমর করে রাখার এই হয়তো সর্বার্থ সাধক পন্থা।

শেকসপীয়রকে আমাদের মানুষ বলার অনেক কারণ রয়েছে নিশ্চয়ই। বিশেষজ্ঞ শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে যতোই বাক বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হোক না কেন সবাই কিন্তু তাঁকে আমার করে পেতে চেয়েছেন। পিউরিটান, স্টোয়িকস্, মাক্স স্টিক্‌স্ মোনারকিস্টস্, থিওসাফিস্টস্, হিউমানিস্টস্, এথেয়েস্টস্, সবাই একযোগে তাঁকে নিজেদের বলে দাবী করেছেন। বিশেষভাবে চিন্তা, গবেষণা এবং বিচারের পরই শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে এ ধরণের দাবী ওঠেছে। তবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে শেকস্‌পীয়রের অনন্ত বৈচিত্র্যই এর প্রধান কারণ। বিশ্বের ব্যক্তিদল ও মত নির্বিশেষে তাঁকে আমার করে অনুভব করার মনস্তাত্বিক কারণটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা করি। আমরা যে তাঁকে একান্ত আপনার জন বলে অনুভব করেছি তা নিশ্চয়ই স্পর্ধা বলে পরিগণিত হবে না। আর তা যদি হয়ে থাকে তবে বলবো এ স্পর্ধা আমরা সেই 'inmortal Band' এর নিকটই লাভ করেছি।

শেকস্‌পীয়র সৃষ্ট পাত্র-পাত্রী বা চরিত্রগুলোর মধ্যে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেই যে আমরা এ ধরণের প্রগল্‌ভ উক্তি করতে সাহসী হয়েছি তা

মনে করার যথেষ্ট কোন কারণ নেই। শেকস্‌পীয়র তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কি রকম রহস্যজনক ভাবে অনুপস্থিত তা হয়তো সকলেরই জানা আছে। এই রহস্যময় ব্যক্তি শেকস্‌পীয়র কিন্তু আমাদের একান্ত আপন বলে মনে হয়েছে। যাঁর জন্ম তারিখ, স্কুলের পড়াশোনা, বিবাহ, পত্নীনাম, বৃত্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি নিয়ে এতো অশান্ত হৈ চৈ তাঁকে কি আমাদের বলে অনুভব না করে উপায় আছে। স্ট্রাটফোর্ড আভনের প্রতিভাবান সন্তানটির খুব সম্ভবতো এহলো ইচ্ছাকৃত আত্মগোপন। তাঁর সম্পর্কে বিচারকদের চরম রায় প্রদত্ত হয়নি বলেই আমাদের মতো অভাজনরাও তাঁকে আপন বলে ভাবতে পারি। প্রার্থনা তাঁর সম্পর্কে শত শত সম্ভাবনা যেন দিন দিনই বৃদ্ধি পায়।

এই গোপন অভিলাষের কথা ব্যক্ত করেই যদি 'আমাদের কথা' শেষ করতে পারতাম তবে হয়তো শোভন হতো। কিন্তু শেকস্‌পীয়রের নিকট আমাদের ঋণের কথা একটু বিশেষভাবে আলোচনা না করলে আরো অশোভন হবে, শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে মনীষী কার্লাইল মন্তব্য করেছিলেন যে ইংরেজরা ভারত সাম্রাজ্যের বিনিময়েও শেকস্‌পীয়রকে ছাড়তে প্রস্তুত নয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নিকটও এই স্বল্প ল্যাটিন ও স্বল্পতর গ্রীক জানা লোকটি কি উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত তা হয়তো এতেই অনুমান করা চলে। বেনজন্‌সন শেকস্‌পীয়রের শাশ্বতকালীন সত্তা সম্পর্কে ছিলেন সচেতন—'শেকস্‌পীয়র সর্বকালের'। 'ঈশ্বরের পর বেশি যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি শেকস্‌পীয়র' গ্যায়টের এই উচ্ছ্বসিত উক্তিটি লক্ষ্য করবার মতো। আমাদের শেকস্‌পীয়র চর্চার আদি যুগের নায়কগণ এ সকল মহাজন উক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা তা ঠিক করে বলতে পারিনে। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেলের পর যা সব চইতে বেশি উদ্ধৃত সেই শেকস্‌পীয়র সাহিত্যকে নিশ্চয়ই কোন রকম সার্টিফিকেট পাথেয় করে আমাদের চিত্ত দ্বারে উপস্থিত হতে হয়নি। রোমান বীর সিজারের মতো—'তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন'

একথা বোধ হয় শেকস্‌পীয়র সম্পর্কেও আরো সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা চলে। শেকস্‌পীয়র নাটকের অভিনয় দেখে শেকস্‌পীয়র সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ জাগ্রত হয়। কিন্তু সে অনেকটা পর্বের মুখে ঝাল খাওয়ার মতো। ইংরেজরা অভিনয় করতো আর বাঙালীরা দর্শক হিসেবে উপস্থিত থেকে তা আস্বাদন করতো। এতে কিন্তু প্রকৃত চর্চা হতে পারেনা। শেকস্‌পীয়র চর্চার দিকে প্রথম লক্ষ্য দেখা গেলো হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে। এ হলো শেকস্‌পীয়র চর্চার একটি বলিষ্ঠ দিক। শেকস্‌পীয়র চর্চার দ্বিতীয় দিকটি ছিলো আরো বলিষ্ঠ কারণ সেটিই ছিলো নবতর সৃষ্টির উষালগ্ন। বিদেশী নাটক বিশেষতঃ শেকস্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় আমাদের পাঁচালী যাত্রা অভ্যস্ত রুচিকে অভিনয় ও নাটক সম্পর্কে নতুন ভাবে উদ্দীপিত করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের দেশে যে নাট্য সাহিত্যের উদ্ভব হলো তার মূলে রয়ে গিয়েছেন শেকস্‌পীয়র। ১৮৪৮ এ রোমিও জুলিয়েটের গদ্যানুবাদ বেরিয়েছিলো। ১৮৫২তে হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' এ'দি মার্চেন্ট অব ভেনিসের' নাট্যরূপ দান করেন। এরপর শেকস্‌পীয়রের নাটকের বহুতর অনুবাদ হয়েছে—একাধিকবার সাফল্যের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে সেগুলো অভিনীতও হয়েছে। নাট্য সাহিত্য বিচার এবং নাট্যরস অনুধাবনের যে পন্থা তাও অনেকাংশেই আমরা তাঁর নিকট লাভ করেছি শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ নাটক বলতে এখনো অনেকে শেকস্‌পীয়রের নাটককেই বুঝে থাকেন এবং সেই মানদণ্ডেই নাটক বিচারে প্রবৃত্ত হন। বাংলা সাহিত্যের নতুন যাত্রাপথে শেকস্‌পীয়রের ভূমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ আমাদের সাহিত্যের সঙ্গেও ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন শেকস্‌পীয়র।

কিন্তু শেকস্‌পীয়রকে আমরা কতটুকু যথাযথ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছি এ নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন ডঃ রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত মশায়। তার এ প্রশ্ন সঙ্গত। শেকস্‌পীয়র চর্চার একশো বছর পরেও আমরা শেকস্‌পীয়র

আদর্শের একটি ট্র্যাজেডিও রচনা করতে পারিনি। এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডি ও কমেডিগুলোর নির্ভরযোগ্য অনুবাদ করাও আমাদের দেশে সম্ভব হয়নি। ডঃ দাশগুপ্তের মতে শেকস্‌পীয়রের যথার্থ চর্চার লগ্ন নাকি এখনই যথার্থভাবে উপস্থিত।

ট্রিগুবার্গের অনস্বীকার্য শেকসপীয়রকে আমরা তাঁর ৪০০ জন্ম শত-বার্ষিকীতে নিবিড় করে পাবো এটা আশা করা কি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থালোক'-এ প্রকাশের জন্য পাঠকবর্গ প্রেরিত সুচিন্তিত তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হবে। ইতি—

সম্পাদকমণ্ডলী

গ্রন্থালোক

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সম্পাদক বিমল গুপ্ত কর্তৃক ত্রিপুরা কো অপারেটিভ প্রেস লিঃ, মিউনিসিপ্যাল রোড, আগরতলা হইতে মুদ্রিত এবং বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী, ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকার, আগরতলা হইতে প্রকাশিত।